অতঃ কিম্ ?

—এই লেখকেরই—

রাণুর প্রথমভাগ, রাণুর দ্বিতীয়ভাগ, রাণুর তৃতীয়ভাগ, রাণুর কথামালা, বর্ষায়, বসন্তে, শারদীয়া, নীলাঙ্গুরীয়, বরযাত্রী, বাসর, চৈতালী, হৈমন্তী, দৈনন্দিন, নূতনপ্রভাত, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা, কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার, স্বর্গাদপি গরিয়সী (৩ খণ্ডে), বিশেষ রজনী (নাটিকা), কায়কল্প, হাতে খড়ি, অষ্টক, লঘুপাক, নব-সন্ন্যাস, শ্রেষ্ঠ গল্প (সঞ্চয়ন), কথাচিত্র, তোমরাই ভরসা, উত্তরায়ণ, রূপান্তর

অতঃকিম্‌

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৫০

দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক—ফাইন আর্ট টেম্পাস

ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

আড়াই টাকা

। বইখানি

বন্ধুবর শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-এর হস্তে

সমর্পণ করিলাম।

ব. ভ. ম.

গল্প

মিসেস্ মুখার্জি

ব্যাপারটিতে আমার অনুচর হনুমান তেওয়ারীর গোড়া হইতে খানিকটা হাত ছিল ; বাকিটা স্বয়ং রামানুচর হনুমানের অনুগ্রহ, কি শুদ্ধ কাকতালীয়, সে বিষয়ে এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। যাহাই হউক, সোজাসুজি বিবরণটা দিয়া যাই।

নিতান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম ; কলিকাতায় একবার যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন, একেবারে অনিবার্যভাবেই, অথচ গত রাজনৈতিক বিক্ষোভের পর ট্রেনের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, দেখিলেই বুক শুকাইয়া যায়। আর শুধু যে দেখিয়াই খালাস পাইয়াছি এমনও নয়, কাছাকাছি দুই-একটা জায়গা যাইতে পর্যন্ত হইয়াছে ; দুয়ার টপকাইয়া ভিতরে পৌঁছিতে পারি নাই। সেকেণ্ড ক্লাসের কথা বলিতেছি।

তবু না যাইলেই নয়। নিতান্ত প্রয়োজনীয় গোটাকতক জিনিস আর বিছানার খুব একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ একটা হোল্ড-অলের মধ্যে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া, স্যুট পরিয়া বারান্দায় চিন্তিতভাবে পায়চারি করিতেছি, তেওয়ারী আসিয়া খবর দিল, ফিটন আসিয়া ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়াছে। তেওয়ারী আমার আরদালী ; আগে পুলিসে কাজ করিত, অবসর গ্রহণ করিয়া আমার কাছে আছে।

বলিলাম, "তা তো এসেছে, কিন্তু যাই কি করে বল্ দিকিন তেওয়ারী ?"

তেওয়ারী মুখটা নীচু করিয়া কি যেন একটু ভাবিল, তাহার পর দুই-তিন বার আমার পানে চাহিল, যেন কিছু বলিতে চায়, অথচ সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। প্রশ্ন করিলাম, "ঠাউরেছিস্ কিছু উপায় ?"

তেওয়ারী অল্প একটু হাসিয়া বলিল, "উপায় তো মানুষে কোন করতে পারে না হুজুর, মানুষের বেশে জন্মেছিলেন বলে রামচন্দ্রজী পর্যন্ত পারেন নি।"

সমস্যা আরও ঘোরালোই হইয়া পড়িল, বলিলাম, "নে, হোল্ড-অল্‌টা তুলে নে, যে ভাবেই হোক্ পৌছতেই হবে, গাড়িরও আর বেশি দেরি নেই।"

তেওয়ারী হোল্ড-অল্‌টা তুলিয়া লইয়া আর একবার কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিল, বলিল, "হুজুর, কিছু ভয় নেই ; শুধু একবারটি যদি…"

কুতূহলী হইয়া বলিলাম, "কি ? বলেই ফেল না।"

"একবারটি যদি মহাবীরজীর মন্দিরে মাথাটা ঠেকিয়ে যান।"

হাসি পাইল, রাগও হইল, এবং আরও যা একটা হইল, সেটা যখন গল্পটা আরম্ভই করিয়াছি তখন খুলিয়া না বলিলে চলিবে না। অর্থাৎ একটু ভয়ও হইল, ঠিক যাহাকে বলা যায় খটকা-লাগা, বিপদের সময় আর যাত্রার মুখে সেটা খুব দুর্ভেদ্য মনের দুর্গেও কি করিয়া মাথা গলাইয়াই বসে। তাহা ভিন্ন বিক্ষোভের সময় অত বিপদের মধ্যেও যে আমরা অক্ষত থাকিয়া গিয়াছি, তেওয়ারীর মতে সেটা মহাবীরজীর কৃপাতেই। কথাটা যে ঠিক বিশ্বাস করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না ; তবে বিপদের আবহাওয়াটা সম্পূর্ণ কাটিয়া না গেলে স্পষ্টভাবে অবিশ্বাস করিতে সাহস পাইতেছি না। মোটের উপর, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট আর কৃত্তিবাসের রামায়ণের মাঝখানে ভীষণ এক দোটানায় পড়িয়া দিনাতিপাত করিতেছি।

কিন্তু মনে যাই থাক, দেবতাকে পশুরূপে পূজা করিতে, তাও আবার স-লাঙ্গুল পশুরূপে পূজা করিতে কোথায় যেন বাধে একটু, বিশেষ করিয়া আমাদের বাংলায় রামানুচরকে যখন এতটা প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। বলিলাম, "চল্, এগো; আমি মহাবীরজীর প্রভু স্বয়ং রামচন্দ্রকে মনে মনে স্মরণ করে নিয়েছি, বিপদ যদি কাটবার তাইতেই কাটবে।"

তেওয়ারী হোল্ড-অল্‌টা বাঁ কাঁধে তুলিয়া আবার হাসিয়া বলিল, "রামচন্দ্রজী পুরণ্-ব্রহ্ম্ ভগবান বটে হুজুর, কিন্তু নিজের শক্তিতে কিছুই করতে পারেন না, নররূপী কিনা! আর পূজো তিনি হনুমানজীর মারফৎই নিয়ে থাকেন হুজুর; এই শহরেই এত মহাবীরস্থান, একটাও রামচন্দ্রের মন্দির দেখেছেন? প্রভু তো নিজের মুখেই বলেছেন—

শুনহ বচন এহি লছুমন ভ্রাতা।
অঞ্জন-সুত-হৃদি পূজন পাতা॥"

একটু সুরের সঙ্গে প্রমাণটা দিয়া তেওয়ারী হাসিমুখেই আমার পানে চাহিয়া রহিল। যাত্রার সময় একটা দ্বিধা-সংকোচে পড়িয়া মনটা খিঁচড়াইয়া যাইতেছিল, তবু হাসিয়াই বলিলাম, "এগো দিকিন্ তুই, গাড়িতে ভিড়, তা মহাবীরজী কি করবেন?"

পা বাড়াইলাম। তেওয়ারীও অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "বজরংবলী সম্বন্ধে অমন কথা বলবেন না হুজুর, গোটাকতক লোক আটকে রাখা তো তাঁর পক্ষে কিছুই নয়, যদি ইচ্ছে করেন তো সমস্ত গাড়িটাকেই কড়ে আঙুলের ঠেলায় কাৎ করে দিতে পারেন।"

ক্রমেই বাড়াইয়া তুলিতেছে। ঠিক করিলাম, ওর এই অন্ধ বিশ্বাসেই ঘা দেওয়া ভালো; একে লইয়াই যখন কাজ চালাইতে হইবে তখন যতটা এর মনটা সংস্কারমুক্ত হয়, ততই আমার সুবিধা—আজ না হোক্, অন্তত ভবিষ্যতের পক্ষে। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিলাম, "তেওয়ারী, মহাবীরজী আসলে গাছের হনুমানও নয়, কিংবা স্বর্গের দেবতাও নয়, উনি

একজন মহাপুরুষ ছিলেন, ওঁকে আমরা শ্রদ্ধা আর সম্মান করতে পারি, কিন্তু তাই বলে যে দেবতাজ্ঞানে⋯"

তেওয়ারী মোট লইয়া আগে আগে যাইতেছিল, ঘুরিয়া দাঁড়াইল। আমায় শেষ করিতে না দিয়া সেইরকম ভাবেই অল্প একটু ব্যঙ্গ-হাস্যের সহিত বলিল, "হাজার মহাপুরুষ হ'লেও সমুদ্র ডিঙনো কারুর সাধ্যিতে কুলোবে না হুজুর ; পাশেই তো সদরালা সাহেব রয়েছেন—হরিন্দরবাবু, অত টাকা মাইনে, অতবড় লাস, সামনের থানাটা একবার ডিঙিয়ে যেতে বলুন না হুজুর।"

আর তর্ক করিতে ইচ্ছা হইল না। নীরবে ফিটনে যাইয়া বসিলাম।

একটু পরেই বুঝিলাম, নীরব থাকাটা ভুল হইয়াছে, দুই-একটা মন্তব্য করিয়া আলোচনাটা সাঙ্গ করিয়া ফেলিলেই ভালো ছিল। স্টেশনের রাস্তার ধারেই খানিকটা জায়গা লইয়া মহাবীরস্থান। একটা অশ্বত্থগাছের তলায় একটি ছোট মন্দিরে সিন্দুরচর্চিত হনুমানমূর্তি। রজনীর পূজা শেষ হইয়া ভজনের আয়োজন হইতেছে, বেশ অনেকগুলি লোক জড় হইয়াছে।

তেওয়ারী কোচবাক্সে বসিয়া ছিল, কোচম্যানকে বলিয়া হঠাৎ গাড়িটা থামাইয়া দিল এবং আমি কিছু বলিবার পূর্বেই লাফাইয়া পড়িয়া ভজনমণ্ডলীর মধ্যে চলিয়া গিয়া 'সাহেব দর্শন করনে আতেহেঁ' বলিয়া মন্দির পর্যন্ত একটু পথ তৈয়ার করিয়া লইল। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া প্রসন্ন বদনে বলিল, "এবার চলুন হুজুর!"

অবাক হইয়া সারা ব্যাপারটা দেখিয়া গেলাম। বুঝিলাম, কি ভুলটা হইয়াছে, অর্থাৎ চুপ করিয়া যাওয়ায় তেওয়ারী ধরিয়া লইয়াছে যে আমি ওর কথাটা শেষ পর্যন্ত অকাট্য বলিয়া মানিয়াই লইলাম। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। লোকেরা শুধু যাইবার পথই করিয়া দেয় নাই, একজন

পদস্থ বাঙালীকে মহাবীরস্থানে আসিতে দেখিয়া বেশ একটু সম্ভ্রমের সহিত দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে। আমি ক্ষণমাত্র বোধ হয় একটু ইতস্তত করিয়া থাকিব, তাহার পর জুতা খুলিয়া নতমস্তকে নামিয়া গেলাম এবং পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া মূর্তির সামনে রাখিয়া ইস্ত্রি-করা প্যাণ্টালুনের ভাঁজের মায়া ছাড়িয়াই একটি কেতাদুরস্ত প্রণাম ঠুকিয়া দিলাম। পূজা হইল কি আত্মমর্যাদা রক্ষা হইল, অতটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর ছিল না।

বিস্মিত, শ্রদ্ধান্বিত দর্শকদের দিকে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তেওয়ারী আবার আমায় গাড়ির সমীপে লইয়া আসিল।

স্টেশনে গিয়া দেখিলাম, গাড়ি আসিয়া গিয়াছে, ভিড়ের চোটে গাড়ি তো দূরের কথা, প্ল্যাট্‌ফর্মে পর্যন্ত জায়গা নাই; তাহার উপর ব্লাক-আউট তো আছেই। অত্যন্ত রাগ ধরিল গর্দভটার উপর, অযথা কারে ফেলিয়া দুই-দুইটা টাকা খরচ করাইয়া দিল এই দুর্দিনে! অবশ্য আমি ভদ্রতর কিছুই আশা করি নাই, তবুও একবার ওর মহাবীরকে শুদ্ধ টানিয়া একটা ধমক না দিয়া পারা গেল না; ঘুরিয়া বলিলাম, "কি ব্যবস্থা তোর মহাবীর করে রেখেছেন তা..."

কিন্তু মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কোথায় তেওয়ারী!

ভিড় চিরিয়া চিরিয়া অস্থিরভাবে এদিক ওদিক করিয়া ফিরিতেছি, এমন সময় তেওয়ারীর আওয়াজ কানে গেল; দেখি, শেষের দিকে একটা সেকেণ্ড ক্লাসের দোরের কাছে দাঁড়াইয়া "আঁঈ হুজুর! আঁঈ হুজুর!" করিয়া প্রবলবেগে হাত নাড়িতেছে। চাপ ভিড়ের ভিতর দিয়া সামনে আসিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখি, তেওয়ারী জি-আই-পি-আর-এর একখানি সম্পূর্ণ খালি ডবলবার্থ কূপের সামনে দাঁড়াইয়া; লগেজটা পূর্বেই ভিতরে রাখিয়া দিয়াছে।

প্রথমটা খুবই বিস্মিত হইয়া পড়িলাম, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলাম কামরাটা রিজার্ভ করা। চশমা চোখে দিয়া নামটা পড়িতেই আবার বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, কার্ডে নির্ভুলভাবে আমাদের দুইজনের নাম লেখা—মিস্টার এস্. এন্. মুখার্জি অ্যাণ্ড মিসেস্ মুখার্জি।

রিজার্ভ আমি করি তো নাই-ই, চেষ্টা করিলেও পারিতাম না, কেন না এক নিতান্ত প্রথম শ্রেণীর গবর্মেণ্ট কর্মচারী ব্যতীত ও-সুযোগ কাহাকেও দেওয়া হইতেছে না আজকাল, তাহাও অল্প আয়াসে নয়। জজেরও নাম জানি, ম্যাজিস্ট্রেটেরও নাম জানি, পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরও নাম জানা আছে, কেউ এস্. এন্. মুখার্জি তো নয়ই, মুখার্জির ধার দিয়াও যায় না।

তেওয়ারীকে প্রশ্ন করিলাম "তুই রিজার্ভ করিয়ে রেখেছিলি?"

তেওয়ারী বলিল, "না হুজুর, আমি সমস্ত দিনে বাড়ি থেকে বেরুলাম কখন? তা ভিন্ন একজন টিকিস্‌বাবু বললেন, এতে মাইজীরও নাম আছে নাকি; মাইজী তো এখানে নেইও।"

যেন এর পরেও আমার মহাবীরজী সম্বন্ধে কি বলিবার আছে শুনিবার জন্য বিজয়োৎফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিলাম ঠিকই তো বলিতেছে, মাথাটা এমন গুলাইয়া গিয়াছে যে, এ সামান্য কথাটুকুও খেয়াল হয় নাই। বলিলাম, "সে যাই হোক্, তুই হোল্ড-অল্‌টা নামা, দেখ্, অন্য কোথাও জায়গা আছে কি না।"

যেন অত্যন্ত অদ্ভুত আর অবিবেচকের মত কথা বলিয়াছি, এইভাবে নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত আমার পানে চাহিয়া তেওয়ারী প্রশ্ন করিল, "কেন হুজুর, এখানে কি হ'ল? শোলেন্দরনাথ মুকুর্জি তো স্পষ্ট লেখা রয়েছে। টিকিস্-কালেক্টারবাবু বললেন ইস্ মানে শোলেন্দর, ইন্ মানে…"

বলিলাম, "এ দেখছিস্ অন্য কারুর জন্যে রিজার্ভ করা, নাম এক বলেই আমার হয়ে যাবে?—নামের মিল কখন কখন হঠাৎ একরকম হয়ে যায়। নে, নামা শীগ্‌গির, দেখি অন্য কোথাও যদি এখনও পাওয়া যায় একটু জায়গা।"

পা বাড়াইলাম।

তেওয়ারী আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল, এইবার ব্যাকুল হইয়া পড়িল; ঘুরিয়া আমার সামনে আসিয়া একটু ঝুঁকিয়া হাতজোড় করিয়া প্রবল মিনতির সহিত বলিল, "অমন কাজ করবেন না হুজুর, কোনমতেই করবেন না। এ মহাবীরজীর বন্দোবস্ত, রিজিক্ট করে দিলে ভয়ানক খাপ্পা হয়ে যাবেন। উনি যা মেহেরবানি করে দেন, প্রসন্ন্ মেজাজে না নিলে অনর্থ করে তোলেন হুজুর, আপনি যাবেন না এ কামরা ছেড়ে, কোনমতেই যাবেন না হুজুর।"

মহা ফ্যাসাদে পড়িয়া গেলাম আবার পাগলাকে লইয়া। যাঁহাদের রিজার্ভ করা, তাঁহারা যে কোনও মুহূর্তে আসিয়া পড়িতে পারেন, ওদিকে এক ছটাকও জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনাটা ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সবচেয়ে ভয় হইতেছিল কেলেঙ্কারির, লোকগুলার নেহাৎ নাকি অপর সম্বন্ধে কৌতূহলী হইবার অবস্থা নয়, তবে একটু স্থির হইলেই যে আমাদের চারিদিকে একটি আলাদা ভিড় জমিয়া যাইবে, সেটা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

হতভম্ব দেখিয়া তেওয়ারী আরও জোর লাগাইয়াছে, বলিতেছে, "আর আগে-পিছে করবেন না হুজুর, উনি এইতেই বোধ হয় চটে যাচ্ছেন; না বিশ্বাস হয় একটা চৌপাই শোনাই হুজুরকে; একবার তাঁর প্রসাদ খেতে না চাওয়ায়···

দম্ভ নিপেষি তব্ পবন-তনয় বলী—"

অবশ্য ঠিক করিয়া ফেলিলাম, তুলসীদাসের চৌপাই আর দোহার উপর

নির্ভরশীল এতবড় ভক্তকে লইয়া আমার কাজ চলিবে না, কিন্তু সে সময় ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হইয়া যায় দেখিয়া চৌপাই শেষ করিতে না দিয়া ভালভাবেই একটু নিম্নকণ্ঠে বুঝাইয়া বলিলাম, "শোন্ তেওয়ারী, হনুমানজী রামচন্দ্র আর সীতার সেবা নিয়ে অষ্টপ্রহর ব্যস্ত আছেন,—মহাভক্ত!—আমার গাড়ি রিজার্ভ করতে আসার তাঁর সময় কোথায়, বল্ না? আসল কথা, বড় বড় অফিসারদের মধ্যে দেখাশোনা, পরামর্শটা খুব বেড়ে গেছে আজকাল, আমার মনে হয় অন্য কোন জেলা থেকে কালেক্টার বা পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, যেই হোক এখানে এসেছেন, রাত্রে ফিরে যাচ্ছেন। এ-আর-পি-র কোন অফিসারও হতে পারেন, ওঁরা এই গণ্ডগোলে স্পেশাল ডিউটিতে কাজ করছেন, এমন কি মিলিটারির···"

তেওয়ারী সবটা নতদৃষ্টি হইয়া শুনিল, তাহার পর বলিল, "হুজুর, আপনি মহাবীরজীকে জানেন না তাই বলছেন; হাজার সেবার মধ্যেও একটা সীট রিজার্ভ করা তাঁর পক্ষে কিছুই নয় হুজুর, রাবণ নিধন করে তাঁর হাতে সময়েরও অভাব নেই আজকাল এটা তো সবাই জানে। তা ভিন্ন যদি আপনার কথাই ধরে নিই হুজুর, তো যারা রিজার্ভ করেছে, ভক্তের জন্যে ঠিক তাদের গাড়িশুদ্ধ আছাড় খাওয়াবেন রাস্তায়। স্টেশনে পৌঁছুতে দেবেন ভেবেছেন? বেশি নয়, তাঁর একটি রোঁয়া দিয়ে একটা ঠেলা দেওয়া···আপনি উঠুন হুজুর, ক্রমাগতই লোক এসে দেখে যাচ্ছে।"

ভদ্রলোক আসিয়া পড়িলেও যে নিষ্কৃতি পাই!

নিরাশ হইয়া মনে মনে বলিলাম, "হে রামানুচর; যতটা বলছে, তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয় তো তুমি আপাতত তোমার এ উৎকট ভক্তের হাত থেকে আমায় আগে রক্ষা করো।"

বেশ শান্তভাব অবলম্বন করিয়া তেওয়ারীকে বলিলাম, "আচ্ছা, তুই আমার একটা কথার উত্তর দে আগে, তারপর দেখা যাবে; আমার জন্যে না হয় রিজার্ভ করলেন, তোর মাইজীর জন্যে কেন করতে গেলেন?

অতবড় রামায়ণের যুদ্ধটা যিনি চালাতে পারলেন, তাঁর এটুকু হিসেব জ্ঞান তো নিশ্চয়ই থাকতো ?"

তেওয়ারী বাধা পাইবার ভয়ে বিনা গৌরচন্দ্রিকায়ই আগে আওড়াইয়া দিল—

"সীতা দরশন অতি সুখ পাই।
হনুমৎ ফিরি গেল লঙ্কা জলাই ॥

হুজুর, সীতার সন্ধান নেওয়াই তাঁর কাজ ছিল, সেইটুকু সেরেই চলে আসতে পারতেন, লঙ্কা পোড়াতে গেলেন কেন ? আসল কথা ওঁরা দেবতা, যা করেন একটু বেশি করেই করেন হুজুর। তাই আপনার সঙ্গে মাইজীর বিজার্ভটাও করে রেখেছেন।"

কোন উপায়ই নাই , ভয় হইল, ভক্তির মাত্রা বাড়িতে বাড়িতে বুদ্ধির মাত্রা এর যেমন কমিয়া আসিতেছে, অচিরেই একটা বিসদৃশ কিছু করিয়া লোক জড়ো করিবে। ইতিমধ্যে মনে মনে একটা মতলবও ঠিক করিয়াছিলাম, অর্থাৎ ওকে সরাইয়া দিই, তারপর না হয় চেষ্টা করিব একবার,—তেওয়ারী থাকিতে অসম্ভব।

ঠিক এই সময় আর একটা ব্যাপার হইল, যাহাতে আমিও জানিয়া-শুনিয়াই আরও আবদ্ধ হইয়া পড়িলাম। ফিরিয়া দাঁড়াইতেই একটি টিকিট-কালেক্টার দুইজন বেহারী ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া আসিয়া কুপের মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া—কার্ডে নজর পড়ায় নামিয়া নাম দুইটা পড়িল, তাহার পর আমার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আপনি মিস্টার মুখার্জি ?"

বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ ?"

সন্দেহের যুগ চলিয়াছে, তিনজনে একবার চারিদিকে চাহিল, বেহারী ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন আর মনের ভাবটা চাপিতে পারিল না ; প্রশ্ন করিল, "মিসেস মুখার্জি···"

বলিলাম, "তিনি আসছেন।"

"মাফ করবেন।"—বলিয়া টিকিট-কালেক্টার তাঁহাদের লইয়া চলিয়া গেল।

তেওয়ারী বোধ হয় হনুমানের নাম জপ করিতেছিল, যেন একটু বিরক্তির সহিত হাতের একটু ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "উঠে পড়ুন হুজুর, একটা কাণ্ড না বেধে বসে। একজন মাইয়া লোগ কেউ থাকলে বড় ভালো হ'ত। মহাবীরজী কাজ একটু বাড়তি করে ফ্যাসাদ বাধিয়েছেন দেখছি।"

ধীরে ধীরে গিয়া উঠিয়া বসিলাম।

যতক্ষণ জাগিয়াছিলাম, কি উদ্বেগে যে কাটিল, মহাবীরজী যদি সত্যই থাকেন তো তিনিই বুঝিয়া থাকিবেন। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করিতেছি, আসল মিস্টার মুখার্জি সস্ত্রীক আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। যতই আসিতেছেন না, উৎকণ্ঠা ততই বাড়িয়া যাইতেছে। একপ্রস্থ ভীষণ লজ্জায় পড়িতে হইবে, যদি সে-রকম প্রকৃতির লোক হন তো অপ্রীতিকরও কিছু হইয়া যাওয়া আশ্চর্য নয়, একজন মহিলার সামনেই। একজনের নামকে আত্মসাৎ করিবার এই দুরভিসন্ধি, এর কি জবাবদিহি আছে আমার কাছে? একটা যে মুখরোচক মিথ্যা বলিব, তাহাও এই মানসিক অবস্থায় মাথায় আসিতেছে না।

বসিয়া একটু পরেই নামিয়া একটু সন্ধান করিতে যাইব, চাকরদের কামরা হইতে তেওয়ারী তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল; প্রশ্ন কবিল, "কিছু দরকার আছে হুজুরের?"

প্রথমটা একটু ধাঁধা খাইয়া গেলাম, সেটা সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "না, কত দেরি তাই খোঁজ নিচ্ছিলাম।"

"আপনি উঠে বসুন।"—বলিয়া তেওয়ারী স্টেশনের দিকে চলিয়া

গেল। অল্পক্ষণ পরেই সংবাদ আনিল, আপ লাইনে আবার জোড় খুলিয়া দিয়াছে বলিয়া কলিকাতার গাড়িটা ডাউন লাইন দিয়া আসিতেছে, সেটা আসিয়া পড়িলে এ গাড়িটা ছাড়িবে। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেকের কাছাকাছি দেরি হইবে।

কি দুর্দৈব!

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম, এতক্ষণ তেওয়ারী তাহার অটল বিশ্বাসে খুব সপ্রতিভ আর প্রফুল্ল ছিল, এই নূতন খবরটা পাইয়া এখন যেন একটু চিন্তান্বিত। আমি একটু উৎসাহ পাইয়া বলিলাম, "তা হ'লে অন্য গাড়িতে দেখিগে চল্ তেওয়ারী, ওরা যেমন দেরি করেছে, তাড়াতাড়ি গাড়িটা ছেড়ে গেলে ওদের ফেল্ করবারও একটা সম্ভাবনা ছিল, এখন দেখছি…"

তেওয়ারী উদ্বিগ্নভাবে আগাইয়া আসিল, বলিল, "না না হুজুর, আপনি গিয়ে বসুন; মহাবীরজী আরও পাকা বন্দোবস্ত করিয়ে দেবেন। কোনও ভাবনা নেই আপনার।"

অগত্যা উঠিয়া যাইতে হইল। আর মনও এদিকে অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে। মরিয়া হইয়া একটা প্ল্যানও ঠিক করিয়া ফেলিলাম, তাহার পর যাহা হইবার হইবে। হোল্ড-অল্‌টা খুলিয়া বিছানাটা উপরের বার্থে পাতিয়া ফেলিলাম। সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অক্ষরে আমার নাম লেখা একটি অ্যাটাশি-কেস ছিল, যাহাতে সহজেই দৃষ্টি পড়ে এইভাবে সেটা শিয়রের দিকে খাড়া করিয়া রাখিয়া দিলাম। তাহার পর উপরে উঠিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম; ভাবিলাম, যদি ভদ্রলোক ভালমানুষ হন তো দুঃসময়ের কথা ভাবিয়া না জাগাইতেও পারেন, যদি অ্যাটাশি-কেসটার উপর নজর পড়ে তো ভাবিতে পারেন, একটা ভ্রান্তির বশেই তাঁহাদের একটা বার্থ অধিকার করিয়া বসিয়াছি তাড়াতাড়ি, ব্ল্যাক-আউটের হিড়িকে। দুঃসময়ে মানুষকে একটু সহানুভূতিসম্পন্নও তো করিয়া তুলিয়াছে।

ঘুমের ভান করিতে করিতে কখন সত্য সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না, এক সময় অনুভব করিলাম, বেগ রুদ্ধ করিতে করিতে গাড়িটা দাঁড়াইয়া পড়িল। কে একজন স্টেশনের নামটা হাঁকিয়া চলিয়া গেল, তন্দ্রার ঘোরে ভালো করিয়া শুনিতে না পাওয়ায় কৌতূহলবশে মুখটা একটু নামাইয়া দুয়ার-পথে প্রশ্ন করিব, নিচের বার্থে চক্ষু পড়িয়া বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গলাম। সমস্ত বার্থ টা দখল করিয়া কে একজন আমারই মতন লম্বালম্বি হইয়া শুইয়া আছে আগাপাশ্‌তলা একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া। প্রথমটা মাথা একটু গুলাইয়া গেল, তাহার পর একে একে সব স্পষ্ট করিয়া মনে কবিলাম—মহাবীরস্থান, স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, ব্ল্যাকআউট, ভিড়, রিজার্ভ—না, কোন সন্দেহ নাই যে একলাই ছিলাম আমি, আর কুপেটাও রিজার্ভ করা আমার নামেই। রিজার্ভ করা কামরায় কে মত না লইয়া উঠিল ?

হঠাৎ খেয়াল হইল, বোধ হয় মিস্টার মুখার্জি, আসলে যাহার নামে রিজার্ভ করা। আমি ঘুমাইয়া পড়িবার পর আসিয়া থাকিবেন। তাহা হইলে ভদ্রলোক একলাই আসিয়াছেন।

কো-ইন্‌সিডেন্সের বিশেষত্ব দেখিয়া একটু বেশ কৌতুক বোধ হইল—এক নামের দুইজনে একই কামরায় উঠিব আজ—একজনের সস্ত্রীক থাকিবার কথা, কিন্তু পাছে দুই শৈলেনের মধ্যে সঙ্গচ্যুতি ঘটে, ওঁকে এককই আসিতে হইল। যোগাযোগ মন্দ নয়। যাই হোক, ব্যাপারটা লইয়া আর ঘাঁটাঘাঁটি করা সমীচীন মনে করিলাম না, যদি মিস্টার মুখার্জিই হন তো তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাওয়া নিরাপদ না হইতে পারে, যদি অন্য কেহ হন তো আমার মত না লইয়া প্রবেশ করিবার স্পর্ধাটা মার্জনা করিলেও ক্ষতি নাই।

মুখটা টানিয়া লইতে যাইব, বার্থের অপর দিকটায় নজর পড়ায়—এবার যা বিস্মিত হইলাম, তাহাতে যে টলিয়া পড়িয়া গেলাম না এইটেই

আশ্চর্য—বার্থের পায়াটার কাছে একজোড়া লেডিজ্ স্থ! স্পষ্ট একেবারে, হীল-তোলা, স্ট্র্যাপ-দেওয়া, হাল ফ্যাশানের একজোড়া লেডিজ্ স্থ!

মাথাটা পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল, আবার একচোট গুলাইয়া গেল। স্ত্রীলোক কে আসিয়া শুইল আবার? কোন মেম-সাহেব নয়, গায়ে যে র‍্যাপার ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে সেটা সাহেবী নয়। ওদের পদ্ধতি কি জানা না থাকিলেও, মেম-সাহেব যে গাড়িতে জুতা খুলিয়া শুইবে, এটাও যেন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এই সময় সঙ্গিনী ঘুমের মধ্যেই সামান্য একটু পাশ ফিরিতে পায়ের কাছে শাড়ির স্কার্ট পাড়ের খানিকটা বাহির হইয়া পড়ায় আমার চিন্তার মোড়টা একেবারে ফিরিয়া গেল। তবে কি মিস্টার মুখার্জি সস্ত্রীকই আসিয়াছিলেন? আমায় না উঠাইয়া স্ত্রীকে নিম্নের বার্থে জায়গা করিয়া দিয়া অন্য সেকেণ্ডক্লাস, হয়তো ফার্স্ট ক্লাসেই চলিয়া গিয়াছেন?···মাথাটাকে বেশ একচোট ঝাঁকানি দিয়া লইলাম—এরকম একটা অসম্ভব আর হাস্যকর কল্পনা যেখানে উঁকি মারিতেও পারে, সে মস্তিষ্কের জড়তা নিশ্চয় পুরামাত্রাতেই রহিয়াছে এখনও। একবার মনে হইল, যেই থাক, অধিকারীই হোক্, বা অনধিকারীই হোক, আমার নিজের জায়গায় পড়িয়া রাতটা কাটাইয়া দিতে পারিলেই হইল। যদি সকাল পর্যন্ত থাকে, কথাটা আপনিই পরিষ্কার হইয়া যাইবে, মাঝে কোথাও নামিয়া যায়, কোন কথাই নাই। কম্বলটা টানিয়া লইয়া চক্ষু বুজিলাম।

কিন্তু অস্বস্তিটা কাটাইয়া উঠা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছিল, একটা স্টেশন পর্যন্ত, অনুমান প্রায় ঘণ্টাখানেক, কথাটা মনে তোলাপাড়া করিতে করিতে মাথাটা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, সমস্যাটা না মিটাইয়া লইলে রাত্রিটা অনিদ্রাতেই কাটাইতে হইবে।

গাড়িটা পরের স্টেশনে থামিলে মনে হইল, একবার গলা-খাঁকারি দিয়া নিদ্রাগতা স্বয়ং রহস্যময়ীকে জাগাই। আবার ভাবিলাম, কাজটা

কোনমতেই ভদ্রানুমোদিত হইবে না; একবার এও মনে হইল, বপুটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যে রকম দশাসই বলিয়া মনে হইতেছে, কোন বড় বাঙালী অফিসারের পরিবার হওয়াই সম্ভব; যদি মিসেস মুখার্জিই হন তো আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই—পুরা একখানি বার্থ নিতান্তই দরকার বলিয়া মিস্টার মুখার্জি এইখানেই ছাড়িয়া অন্যত্র মাথা গুঁজিতে গিয়াছেন একটু। অবশ্য মিস্টার মুখার্জিকে খুবই ভালো বলিয়া ধরিয়া লইতে হইল।

চিন্তার মধ্যেই মনে হইল, তেওয়ারী ব্যাপারটা জানিতে পারে। আমি গাড়ি ছাড়িবার পূর্বেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; কিন্তু তেওয়ারী নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত জাগিয়া ছিল, কেন না তাহার একটা সন্দেহ লাগিয়াই ছিল যে, আমি নামিয়া গাড়ি বদল করিয়া ফেলিতে পারি; একবার চেষ্টা করিয়াও ছিলাম তো।

আর ইতস্তত না করিয়া খুব সন্তর্পণে বার্থ হইতে নামিলাম। সন্দেহটা আরও দৃঢ় হইল, নামিতেই নজরে পড়িল—সঙ্গিনীর মাথার কাছের হুকটিতে একটি ভ্যানিটি-ব্যাগ টাঙানো। অল্প যাহা একটু খুট খাট আওয়াজ হইল তাহাতে কিন্তু তাঁহার নিদ্রার কোন বিঘ্ন হইল না।

চাকরের কামরাটা পাশেই। প্রথমে হাত বাড়াইয়া কয়েকবার আঘাত করিলাম। কোন উত্তর না পাইয়া নিম্ন কণ্ঠে দুইবার ডাক দিলাম; ঠিক যে উত্তর পাইলাম এমন নয়, তবে কামরার মধ্য হইতে জাগরণের একটা গম্ভীর কণ্ঠ-তর্জন আসিয়া কানে লাগিল। ফিরিয়া দেখিলাম, সহযাত্রিণীর কোনও ভ্রূক্ষেপ নাই। আমি প্লাটফর্মের উল্টা দিকে গিয়া ডাকিতেছিলাম, যাতে ওঁর ঘুমে ব্যাঘাতের সম্ভাবনাটা অল্প থাকে। একবার মনে হইল, নামিয়া যাই। কিন্তু বাহিরে তীব্র কনকনে পাহাড়ে হাওয়া যেন সূচের মত বিদ্ধ করিতেছে। ডাকই দিলাম আর একটু জোরে—শীতল হাওয়ায় শুধু আর একটি গলা খাঁকরানি ভাসিয়া আসিল। তখন মাথার উপরে টুপিটা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া বুকের খানিকটা

জানালার বাহিরে বাহির করিয়া দিয়া সাধ্যমত জোরেই চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "তেওয়ারী! এই তেওয়ারী! শুনতা নেহি?"

"জী হুজুর!"—তেওয়ারীর জলদগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর আসিল; কিন্তু আমার পিছনে। চকিতে ফিরিয়া দেখি, তেওয়ারী কুচকাওয়াজের কায়দায় দুই পা জোড় করিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া বার্থের সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

গায়ের র‍্যাপারটা খানিকটা খানিকটা খসিয়া গিয়াছে, মালকোঁচার ওপর অদ্ভুতভাবে পরা একখানা শাড়ি। চোখ-মুখ একেই গোঁফ-দাড়িতে সমাচ্ছন্ন, তন্দ্রা আর হঠাৎ-জাগরণের বিস্ময়ে যেন আরও কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গেছে। উঠিয়াই অভ্যাসমত বোধ হয় জুতা দুইটায় পা গলাইতে গিয়াছিল—ওলটপালট খাইয়া দুইটা দুই জায়গায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমারই স্ত্রীর জুতা।

একটু চাহিয়া থাকিয়াই ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া গেল, ঐ যে ঘণ্টা খানেকের কাছাকাছি সময় হাতে পাইয়াছিল, ইহার মধ্যে বাসায় চলিয়া গিয়া এই ব্যবস্থাটি করিয়াছে। সেই ভদ্রলোকটি যে মিসেস মুখার্জির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল সেটা তেওয়ারীর ভালো বোধ হয় নাই, জায়গাটা খালি রাখা নিরাপদ মনে করে নাই। আমায় যে বলিয়াছিল, মহাবীরজী পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, তাহার অর্থটাও এতক্ষণে পরিষ্কার হইল।

আর কথা বাড়াইলাম না, বাড়াইতে গেলেও তো ঐ কথাই বলিবে অর্থাৎ মহাবীরজীর নিকটই এই মহৎ প্রেরণাটা পাইয়াছে।

মনের সমস্ত রাগ মনেই চাপিয়া বলিলাম, "তুই নেমে যা এইখানেই, অনেক স্টেশন হয়ে গেছে, আর ভয় নেই কারু ওঠবার।"

[শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৫০]

গণৎকার

বাড়ির ছেলে অ,-আ,-ক,-খ, লিখিতে শিখিয়াছে। দেয়ালে ক-খ, মেঝেয় ক-খ, বালিশে ক-খ, ভাতের থালায় ক,-খ ;—কয়লার আঁচড়ে, খড়ির দাগে, শ্লেট-পেন্সিলে, উড্-পেন্সিলে, নখের টানে—যেখানে যেটি মানায়। গৃহস্থ বিপন্ন, সামাল সামাল রব পড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু বিপন্ন কি শুধু গৃহস্থই ? ছেলেটির দিক দিয়াও তো ভাবিয়া দেখা উচিত একবার। নবার্জিত বিদ্যার ভারে সে বেচারারও যে ভারসাম্য বিচলিত হইতে বসিয়াছে, সে-কথা ভুলিলে চলিবে কেন ? দুগ্ধপোষ্য শিশু মাঝে মাঝে এ দুর্বহ বোঝা নামাইয়া একটু দম না লইলে তাহার চলে কেমন করিয়া ? আর শুধু শিশু বেচারাই কি এত দোষ করিয়াছে ? বিদ্যার এক অবস্থায় এই মোক্ষম চাপের অভিজ্ঞতা কি আমাদের নিজেদেরই নাই ? চুণোপুঁটিদের ছাড়িয়া লাহিড়ি মহাশয়ের কথাই ধরা যাক্।

আমাদের জ্ঞান লাহিড়ি। বিদ্যার জাহাজ, তিনটি বিষয়ে ফার্স্ট ক্লাশ এম্-এ, তাহার উপর পি-এইচ্-ডি। প্রোফেসার হিসাবে সারা দেশটায় কয়টা লোকই বা তাঁহার পাশে দাঁড়াইতে পারে ? বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য সম্বন্ধে কবে একটা প্রবন্ধ দিবেন, দেশ বিদেশের পত্রিকার সম্পাদকেরা হাঁ করিয়া আছে। প্রবীণ মনীষী ব্যক্তি,—কলেজের লেকচার-রুমেই প্রবেশ করুন, বা কোন বিদ্বৎসভায়ই যান, প্রজ্ঞার একটি অলক্ষ্য জ্যোতি যেন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে। সমস্ত জায়গাটিতে ছাইয়া পড়ে থমথমে গাম্ভীর্যের ভাব।

কিন্তু এ জ্ঞানের চাপের কথা বলিতেছি না। কেন না এর গুরুত্ব বাহিরে যতটা অনুমিত হয় স্বয়ং লাহিড়ি মহাশয়ের কাছে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। নিঃশ্বাসবায়ুর মতোই এটা তাঁহার জীবনে সহজ হইয়া গিয়াছে।

শিশুর কথা অবতারণা করিয়াছি লাহিড়ি মহাশয়ের নবার্জিত বিদ্যার প্রসঙ্গে। তিনি কিছুদিন হইতে সামুদ্রিক বিদ্যা শিখিতেছেন—অর্থাৎ হাত দেখিয়া অদৃষ্ট গণনা। অবিকল শিশুর মতোই ব্যাপার।

লাহিড়ি মহাশয়ের বহির্বাটীর বারান্দায় সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই ডানদিকের গোল থামটিতে লক্ষ্য করিলে এবং লক্ষ্য না করিলেও দেখিবেন পেন্সিল দিয়া একখানি মানুষের করতল আঁকা, মধ্যে সোজা তির্যক্, অনেকগুলি সুস্পষ্ট রেখা। প্রথমে মনে হইবে কোন শিশুর কীর্তি, গৃহস্থের প্রবেশ পথেই কি ভাবিয়া প্রহারের প্রহরী বসাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিবেন করতলটির পাশে ছোট বড় নানা আকারের নানারকম অঙ্ক—যোগ বিয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া রেখাগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি নানারূপ দুরূহ কাণ্ড!

জিনিসটা লাহিড়ি মহাশয়ের হাতের ক-খ। হয়তো কোন দিন কলেজে যাইবার সময় অন্যমনস্ক হইয়া বিদ্যার ভার থামের গায়ে নামাইয়া গেছেন—গুরুভার না নামাইয়া আর পাদমপি চলিতে পারেন নাই।

আপনি বোধ হয় উঠিয়া গিয়া বারান্দার গোল টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসিয়া একখানি খবরের কাগজ তুলিয়া লইলেন। প্রথমেই নবীনতম সংবাদটির জন্য 'স্টপ্ প্রেস' এর স্তম্ভটির উপর নজর ফেলিলেন। দেখেন সেই থামের হাত, পাশে যোগ চিহ্নের মত ঢেরা-কাটা নক্সা, তাহার উর্ধ্বে নিচে দুই পাশে রাশিচক্রের বিচিত্র নাম সব—কর্কট, মিথুন, তুলা, তাহার নিচে সেই রকম দুর্বোধ্য হিসাব।

অন্তঃপুরে আপনার প্রবেশ নাই, নতুবা দেখিতেন সামুদ্রিক বিদ্যার জোয়ার ঘরের আসবাবপত্র এমন কি মাথার বালিস পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য একদিন গভীর রাত্রে লাহিড়ি মহাশয় গৃহিণীর ঘুমন্ত পিঠে পর্যন্ত করকোষ্ঠীর ছক আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া যে বাড়িতে একটা আধচাপা প্রবাদ আছে তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলিতে পারি না।

অন্য বিদ্যা সম্বন্ধে ঝঞ্ঝাট বিস্তর, প্রথম বই কিনুন বা অন্য উপায়ে যোগাড় করুন, আহৃত বই রাখিবার হাঙ্গাম আছে,—আলমারি, র‍্যাক, বুক্‌কেস্, টেবিল, যা-হয় একটা; যথাস্থান হইতে লওয়া, পড়িয়া আবার যথাস্থানে রাখা, আবার সেই যথাস্থান হইতে কার্যগতিকে যদি দূরে রহিলেন তো বিদ্যাও তৎকালের জন্য ধামা-চাপা রহিল।

এ বিদ্যায় ও-ধরণের বখেড়া খুব অল্প, কেন না প্রত্যেকটি মানুষ—ছেলে হোক্, বুড়া হোক্, যুবা বা প্রৌঢ় হোক্, স্ত্রী হোক্, বা পুরুষ হোক্—এ শাস্ত্রের দুইখানি পুস্তক সর্বদাই দুই পাশে লটকাইয়া ঘুরাফিরা করিতেছে। শুধু একবার সংকোচ কাটাইয়া চাহিয়া লওয়া; দোকানে হোক্, ট্রামে হোক্, বাসে হোক্, খেলার মাঠে হোক্, স্টীমার ঘাটে হোক্। এই রকম ধরণের একটা বার্তালাপ:

"ইস্! আপনার যশো-রেখাটা!...খুব বিশিষ্ট কি না, নজর পড়তেই চোখ আটকে গেল।"

"জানেন না কি সামুদ্রিক বিদ্যা আপনি?"

"জানি তা বলতে পারি না, কেন না সমুদ্রের মতোই অতল, তবে কৌতূহল আছে।...দেখতে পারি কি হাতটা?—খুব রিমার্কেব্‌ল্ কয়েকটা বিষয়ে...আপত্তি যদি না থাকে তো..."

"নাঃ, আপত্তি আর কি? কিই বা আমার যাবে আসবে? তবে, মাফ করবেন, খুব বিশ্বাস্ নেই জিনিসটায়..."

বিশ্বাস নাই বলিয়া যে আপনি হাতটা পাইবেন না এমন নয়, কেন না বিধাতা হস্ত বা ললাট যেখানেই হোক্ এমন একটা কূট রেখা বসাইয়া দিয়াছেন যে, বিশ্বাস না করিলেও অদৃষ্ট সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা যাহা কিছু হোক শুনিবার জন্য মানুষ সর্বদা উন্মুখ। এই অদ্ভুত উন্মুখতার লজ্জা ঢাকা দিবার জন্য সে হাতটা বাড়াইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে, "দেখুন, তবে বিশ্বাস করতে মন যায় না।"

ওদিকে আঁকড় কাটা আর এদিকে মাঠে ঘাটে সর্বত্রই ইতর-ভদ্র সকলের হস্ত পরীক্ষা করিয়া লাহিড়ি মহাশয়ের নূতনলব্ধ বিদ্যায় আর মরিচা পড়িতেছে না। আর সর্বদাই শান-পড়া অস্ত্রের মত উৎকটভাবে পরীক্ষোন্মুখ।

বাড়ির সব হাত মুখস্থ, পাড়ারও প্রায় সব হাতেরই পাঠোদ্ধার হইয়া গিয়াছে। যশের ফাঁশ নানা রংবেরঙের দূরের হাত সমস্ত আকৃষ্ট করিয়া হাজির করিতেছে। এত সব ব্যাপারের মাঝে কিন্তু একটা মস্ত বড় ফাঁক থাকিয়া গেছে। অতি যশস্বী ভিষকের মতো লাহিড়ি মহাশয় নিজের দিকে চাহিবার অবসর পান নাই—নিজের হাতটা একবার দেখিয়া রাখিবেন এ ফুরসৎটা আজ পর্যন্ত হইয়া উঠে নাই! দেখিয়া রাখিলে কিন্তু হইত ভালো।

ঢাকায় সাহিত্য কিংবা বিজ্ঞান সম্মেলন, কিংবা দুই একসঙ্গে ঠিক মনে পড়িতেছে না, কেন না এক খরচে একাধিক মেয়ের বিবাহের মতো বাঙ্গালী আজকাল অনেক সময় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন সবগুলাকেই এক বেদীতেই উৎসর্গ করিয়া লইতেছে। অনুষ্ঠানের গোলমাল হোক না-হোক্, স্মৃতির গোলমাল না হইয়াই পারে না।

ঢাকা মেল দাঁড়াইয়া আছে। সব পিছনে, সম্মেলন-যাত্রীদের জন্য

একখানি রিজার্ভ গাড়ি। অনেকে আসিয়া গিয়াছেন, বিছানা-পত্র পাতিয়া গুছাইয়া-সুছাইয়া বসিয়াছেন। নানা রকম গল্প আরম্ভ হইয়া গিয়াছে,... "অতুলদা তো এখন আসবেন না, সেকেণ্ড বেল পেয়ে গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করবে ঠিক সেই সময়ে থল্‌থলে শরীর নিয়ে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়, কোমরের কাপড় আলগা হয়ে গেছে, কুলি ও দিকে মাল তুলে দিয়েছে, মালের মালিক নিয়ে ব্যস্ত"..."ঢাকাই অভ্যর্থনায় এবারেও সেই রকম অষ্টগণ্ডার ব্যবস্থা থাকবে নাকি মশাই?—তা হ'লে শর্মা ফেরৎ গাড়িতেই... বাঁচলে তবে তো সম্মেলন?...উস্, সে কি ঝাল মশাই!—এখনও জিভের ডগা বিষিয়ে আছে।"..."এ র‍্যগ্ কোথাকার?.. মেসোপোটেমিয়ায় নিয়েছিলেন? সেই ফার্স্ট গ্রেট-ওয়ারের সময়কার?–এখনও এ-রকম রয়েছে!—তা হবে না কেন বলুন।—ওদের দেশের উটের পিঠের লোম, কি রকম রোদটা টেনেছে!—"

কোণের দিকে বেশ প্রশস্ত একটি বিছানা পাতিয়া একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। একেবারে কোণটিতে একটি বড় গোছের সুটকেশ, তাহার উপর জড়সড় করিয়া রাখা একখানা ওভারকোট। ভদ্রলোকের গায়ের কোটের বোতাম খোলা, তাহার নিচে পশমী কামিজেরও বোতাম খোলা, দেখিলে মনে হয় শীতকে ভয়ানক ভয় করেন, অথচ গরমকে মোটেই বরদাস্ত করিতে পারেন না।

ভদ্রলোক খুব নিবিষ্ট মনে একজনের হাত দেখিতেছেন। পাশে এবং সামনের বেঞ্চিতে—গাড়ির অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা ভিড় একটু বেশি, এবং একটু একটু করিয়া আরও বাড়িতেছে। কয়েকজন হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে, একজন স্থির নয়নে নিজের হাতের পানে চাহিয়া আছে, দুই-একজন হাতে হাত ঘসিয়া রেখাগুলা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে।

নায়ক যে স্বয়ং আমাদের লাহিড়ি মহাশয় তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। যে-হাতটা দেখিতেছিলেন সেটা সম্বন্ধে যাহা বলিবার

বলিয়া লাহিড়ি মহাশয় প্রসারিত অন্য একটি হাত টানিয়া লইয়া আবার তখনই ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "ডান হাত ; বাঁ হাত মেয়েদের "

গাড়ির দুয়ারের নিকট হইতে একজন চেঁচাইয়া বলিলেন, "জ্ঞানদা, এখানে আমি আছি। ওদিকে তো অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল—এখন এই নতুন কেতুর প্রবেশ হয়েছে, রেখাগুলোতে কিছু…"

পাশের ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, "হাত দেখতে জানেন নাকি উনি ?"

কেতু-কবলিত ভদ্রলোক সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "হাত দেখতে জানেন ! -বাংলার চীরো (Cheiro) বলছে আজকাল ওঁকে !"

"রীয়েলি !—আমার ও জিনিসটায় তত ফেথ্ নেই, কিন্তু একবার দেখালে হয়, লাগে ইণ্টারেস্টিং—মন্দ নয়।"

দ্বিতীয় ঘণ্টি পড়িল, গার্ড হুইসিল্ দিল। অতুলবাবুর জন্য একটা উদ্বিগ্নতা পড়িয়া গেছে। যে ভদ্রলোকটি চিনিতেন শুধু তিনিই তখনও নিশ্চিন্তভাবে প্ল্যাটফর্মের গেটের দিকে চাহিয়া আছেন ; এমন সময় সত্যই দেখা গেল আধভেজান গেট ঠেলিয়া, পাশের চেকারদের স্থানভ্রষ্ট করিয়া একজন গৌরকান্তি স্থূলকায় ভদ্রলোক হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। ডান হাতে কোমরের কাপড় আর কোঁচার উপরের ভাগটা মুঠা করিয়া ধরা, বাম হাতে একটা ওভারকোট, একটা ছাতা, একটা মোটা লাঠি, একটা পাট-করা র‍্যাগ, আর একটা দীর্ঘ টর্চ। তিন-চার গজ আগে বিছানা, স্যুটকেস, টিফিন্-কেরিয়ার, জলের কুঁজা প্রভৃতি লইয়া একটা কুলি। গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে, রিজার্ভ কামরার মধ্য থেকে কয়েকজন হাতমুখ নাড়িয়া নাড়িয়া চীৎকার করিতেছে : "শীগ্গির আসুন দাদা"—"গার্ড সাহেব থামাও একটু"—শুধু সেই অভিজ্ঞ লোকটি নির্বিকার ভাবে বসিয়া সবাইকে আশ্বাস দিতেছেন, "উনি ঠিক উঠবেন—আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?"

কুলি জিনিসপত্র ভিতরে দিয়া ভদ্রলোককে যথারীতি গাড়িসাৎ করিলে, ভদ্রলোকের প্রথম প্রশ্ন, "লাহিড়ি এসেছে ?"

"ঐ যে উনি—যথারীতি জমিয়ে বসেছেন।"

"একবার হাতটা দেখাতে হবে, কেন এরকম বার বার হচ্ছে যে !..."

গাড়িতে তখন বেশ মোশন দিয়াছে, এমন সময় মাঝবয়সী গোছের একজন ভদ্রলোক স্টেশনেরই কোন্ ঘর হইতে বাহির হইয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ইঁহাদেরই গাড়ির পাদানিতে টুপ করিয়া লঘু চরণে উঠিয়া পড়িলেন। হাতে একটি মাঝারি সাইজের স্যুটকেশ্, আর কিছু নয়।

সমস্বরে কয়েকজন আপত্তি করিয়া উঠিলেন, "এটা রিজার্ভ মশাই।"

ভদ্রলোক দরজা ঠেলিয়া উঠিতে উঠিতে মিনতির স্বরে বলিলেন, "পরের স্টপেজেই নেমে যাব, এইটুকু।"

ওদিকটায় অনেকেই নিজের আসন ছাড়িয়া লাহিড়ি মহাশয়কে ঘিরিয়া জড় হইয়াছে ; আগন্তুক অল্প একটু জায়গা লইয়া নিতান্তই সংকুচিত ভাবে বসিলেন।

লাহিড়ি মহাশয়ের আরও দুই তিনখানি হাত দেখা হইয়া গিয়াছে। এখন সেই দরজার কাছের ভদ্রলোকটির হাত পরীক্ষা হইতেছে। লাহিড়ি মহাশয় বলিতেছেন, "ফলাফল আপনাকে যা বলে দিয়েছিলাম তাই—আরে রোজ রোজ তো আর মত বদলাচ্ছে না বিধাতাপুরুষের, তবে আপনি একটা পলা ব্যবহার করবেন...আপনার এই রেখাটার ওপর একটু দৃষ্টি আছে, এই ক্রস্ মার্কটা দেখছেন তো ? ঐ পলায় এটাকে আর স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেবে না।"

'মদনমঞ্জরী'র বিজ্ঞাপনে যেমন দেখা যায়—সেই রকম প্রসারিত হস্তের

গাঁদি লাগিয়া গিয়াছে। লাহিড়ি মহাশয় প্রসন্ন হাস্যের সহিত এক একটি লইয়া রায় দিতেছেন—"অষ্টমাধিপতির স্থানে সপ্তমাধিপতির আগমনের যোগ, একটা পোখরাজ পরবেন···আপনার এখন বৃহস্পতির দশা—অর্থ-বিদ্যার যোগ—শিক্ষকতায় একটা উন্নতির যোগ আসছে···"

উত্তর হইল, "আছে যোগ সত্যিই?···শুনছি তো প্রিন্সিপ্যাল একটা ফেভারেব্‌ল্ কন্‌ফিডেন্সিয়্যাল রিপোর্ট দিয়েছে।"···"তা হ'লে কথাটা ঠিক —হাতের মার্কেও ধরা পড়বে?"···"পড়তে বাধ্য। আগে রেখা, তার পর ঘটনা, বাদ যাবার জো আছে?

সব চেয়ে শেষে যে ভদ্রলোকটি উঠিয়াছিলেন, উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "এত ভিড় কিসের?"

"জ্ঞান লাহিড়ি হাত দেখছেন।"

"খুব বিচক্ষণ না কি?"

"বাংলায় জোড়া নেই এখন। দেখাবেন নাকি?"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "না, কাজ নেই; দেখালেই তো শুনব মৃত্যুযোগ—দেখলেন না, গাড়ি ধরতেই কি রকম একটা ফাঁড়া গেল!"

একটু থামিয়া বলিলেন, "তবে সেদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রুদ্রাক্ষপরা এক বেটা পাঞ্জাবী কি কতগুলো যা তা আউড়ে গেল, বিশ্বাস যত করি আর না করি, মনে খানিকটা ধোঁকা লেগে আছে বটে; দেখলে হ'ত এঁর সঙ্গে মেলে কি না। কিন্তু ওই ব্যূহের মধ্যে ঢোকাই মুস্কিল। আর যদি দেখাতেই হয় তো কাছে বসে দেখানই ভাল, এখান থেকে হাত টেনে নিয়ে দেখবেন, নড়া ছিঁড়ে যাবে মশাই, ওতে রাজি নই···"

যে-হাতটা দেখা হইতেছিল সেটা শেষ হইলে যাহার সঙ্গে কথা

হইতেছিল সেই ভদ্রলোক বলিলেন, "জ্ঞান্‌দা, এই ভদ্রলোকের হাতটা একবার দেখুন তো···ইনি আবার এক পাঞ্জাবী গেরুয়াধারীর পাল্লায় পড়েছিলেন, কি সব বলে দিয়েছে ভদ্রলোককে···উনি আবার পরের স্টপেজ ব্যারাকপুরেই নেমে যাবেন।"

"সত্যি না কি, আসুন তো দেখি।"—লাহিড়ি মহাশয় একটা হাত দেখিবার জন্য সবে হাতে করিয়াছিলেন, ছাড়িয়া দিয়া উৎসুকভাবে আগন্তুকের পানে চাহিলেন।

ইণ্টারেস্টিং কেস্‌ বলিয়া সকলে জায়গা ছাড়িয়া দিল, ভদ্রলোক গিয়া লাহিড়ি মহাশয়ের পাশটিতে বসিলেন।

গাদাগাদিতে বেশ গরম পড়িয়াছে, অন্তত লাহিড়ি মহাশয়ের পক্ষে তো বটেই, তিনি কোটটি খুলিয়া পাশে রাখিলেন। ভিড়ের চোটে সত্যই একটু গরম বোধ হইতেছে, ভদ্রলোকটিও গায়ের র‍্যাপারটা খানিকটা পাশে কোটটার উপর জড় করিয়া রাখিলেন, তাহার পর ডান হাতটা বাহির করিয়া আগাইয়া দিলেন।

লাহিড়ি মহাশয় হাতের চারটা আঙুল একটু উল্টাদিকে টিপিয়া হাতটা ভাল করিয়া চিতাইয়া লইলেন, তাহার পর ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কি বলেছে সে ব্যাটা পাঞ্জাবী মশাই?"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "কেন বলুন তো?"

"ওয়াণ্ডারফুল হাত মশাই! এই এতগুলো হাতের মধ্যে একটাও এ-রকম রিচ্‌ (rich) নয়!···একটা কথা বলুন তো, আপনি কি কোন একটা বড় রকম স্পেকুলেশান নিয়ে যাত্রা করেছেন? মানে, কোন একটা বড় রকম লাভ-লোকসানের ব্যাপার নিয়ে?"

ভদ্রলোক বিস্মিতভাবে মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "সেটা পর্যন্ত ধরা পড়েছে রেখায়, আশ্চর্য তো!"

লাহিড়ি মহাশয় ভালো করিয়া দেখিবার সুবিধার জন্য ওভারকোট্‌টা সুটকেসের উপর হইতে সরাইয়া ভদ্রলোকের র‍্যাপারের উপর রাখিলেন এবং সুটকেস্‌টা খাড়া করিয়া একটু জায়গা করিয়া লইয়া সরিয়া বসিলেন, তাহার পর হাতটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিজের মাথাটাও নানাভাবে নাড়িয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "ঠিক তো? সেই স্পেকুলেশানে ষোল আনা লাভ আপনার, আর সেও এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। বৃহস্পতির এ-রকম যোগ দেখা যায় না সচরাচর—স্পেকুলেশানে লোকের নিজেরও গাঁট থেকে কিছু বের করতে হয়, আপনার যেন সেটুকু লোকশানও নেই···দেখি, এই দিকটা ওল্টান্ তো···লাইন অফ্‌লাক্··ওয়াণ্ডারফুল!"

রাতারাতি বড়লোক হইয়া অন্য মানুষ হইয়া যাইবে—হঠাৎ এমন এক সৌভাগ্যশালীর আবির্ভাবে সকলে অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোক লজ্জিতভাবে বলিলেন, "কিছু ভুল হচ্ছে না তো? আমার কপালে সদ্য লাভ একথা তো এ-পর্যন্ত কোন গণৎকার বললে না। পাঞ্জাবী বেটা বরং বললে—মস্ত বড় একটা লোকসানের যোগ যাচ্ছে—তা সে তো সদ্য সদ্য তার হাত দিয়েই আরম্ভ হয়ে গেছে। অন্য লাভের কথা···"

"যদি না হয় তো আমার সমস্ত বইগুলো নিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দোব।···আপনার অ্যাড্রেসটা বলুন তো? কলকাতায় থাকেন তো?"

ভদ্রলোক ঠিকানা দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আর কি বলে?"

লাহিড়ি মহাশয় হাতটা আবার নানাভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া অনেকক্ষণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, "এদিকে তো চমৎকার চলেছে—শুধুই লাভের যোগ; ওদিকে অনেক পরে শনির একটা যোগ আছে—তা'তে সমুদ্রযাত্রা সূচিত করে···কোন বিপদ আছে কি না ঠিক বুঝতে

পারছি না, একটু ভালো রকম ক্যালকুলেশান করে না দেখলে ধরতে পারছি না…"

এমন সময় গাড়ির বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল।

ভদ্রলোক বলিলেন, "আমায় এখানেই নামতে হবে…"

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "আবার কি সমুদ্রযাত্রার বিপদের কথা বলে দিলেন মশাই ?"

একজন ভদ্রলোক বলিলেন, "আপাতত মোটা দাঁও মারুন তো। আর বিপদের কথা কি বলছেন মশাই ? ও তো স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, লাভের পর লাভে মোটা ব্যাংক্ ব্যালান্স্, তার পরে লম্বা ইউরোপীয়ান টূর…সঙ্গে নেবেন মশাই…"

গাড়ি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিয়াছে। কয়েকজন ভাগ্যবানকে খানিকটা আগাইয়া দিল। একজন দুয়ারটা খুলিয়া হাসিয়া বলিল, "ইউরোপীয়ান টূর তো দূরের কথা, আপাতত নগদ লাভের একটা ফীস্ট্ পাওনা রইল মশাই, ঢাকা থেকে এসেই হাজির হ'ব সদলবলে, ঠিকানা তো জানাই রইল।"

ভদ্রলোক নামিয়া গেলে, গাড়ি ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একজন ক্রু উঠিল।

ওদিকে হাত দেখা আবার সুরু হইল। সকলের কৌতূহল যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। একজন বলিল, "অথচ বেটা পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে কি সব দুর্ভাবনার কথাই বলে দিয়েছিল ! বোগাস্ !"

আবার একজন লাহিড়ি মহাশয়কে প্রশ্ন করিল, "ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফলবে বলছেন আপনি ? আশ্চর্য উন্নতি করেছে তো পামিস্ট্রি !"

লাহিড়ি মহাশয় বলিলেন, "ফলে কি না-ফলে ঢাকা থেকে এসে

জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবেন, এই তিন চারটে দিনের অপেক্ষা। ভদ্রলোক ঠিকানা তো দিয়েই গেলেন।"

অত অপেক্ষাও করিতে হইল না। ক্রু ওদিকে চেক্ করিতে করিতে এই কোণে আসিল; হাতটা সকলের সামনেই প্রসারিত করিয়া বলিল, "টিকেট প্লীজ।"

একে একে টিকিট দেখাইতে লাগিল সকলে। লাহিড়ি মহাশয় ওভারকোটটা সরাইয়া কোটটা তুলিয়া লইলেন। ভিতর পকেটে হাত দিতেই মুখটা বিবর্ণ হইয়া গেল। বুক পকেটে হাত দিলেন, পাশের দুই পকেটে, তাহার পর শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যাগটাই পাচ্ছি না যে! তাতে টাকা পঞ্চাশেকের নোটও ছিল!"

সকলে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

একজন বলিল, "ওভারকোটের পকেটে রাখেন নি তো?"

রাখা হয় নাই, তবুও দেখা হইল, স্যুটকেশ খুলিয়াও দেখা হইল, আশে পাশে, বিছানা তুলিয়া—কোথাও ব্যাগ নাই।

লাহিড়ি মহাশয় যেন আর এক ঝোঁক বিচলিত হইয়া কোটটা তুলিয়া লইলেন, বুক-পকেটে হাত দিয়া শূন্য হাতটা বাহির করিয়া লইয়া বলিলেন "ঘড়িটাও নেই, সোনার চেন-শুদ্ধু!..."

এক গতির আওয়াজ ভিন্ন গাড়িটাতে অন্য কোন শব্দ নাই। সকলেই যেন কাষ্ঠপুত্তলীর মত নিশ্চল নির্বাক হইয়া গিয়াছে, লাহিড়ি মশাইয়ের ভাবটা তো বর্ণনাতীত। বেশ কিছুক্ষণ পরে একজন শুধু ভাগ্যফলের সত্ত লাভের বহরটা নির্ধারিত করিবার জন্য কৌতূহলপরবশ হইয়া প্রশ্ন করিল, "কত দাম ছিল ঘড়িটার?...এদিকে তো নগদ পঞ্চাশ টাকা গেছে বলছেন।...কেমন কৌশল করে আপনার কোটটার ওপর

গায়ের র‍্যাপার খানিকটা বিছিয়ে দিলে! ওর অন্য হাত যে ভেতরে ভেতরে নিজের কাজ গুছোচ্ছে তখন অতটা খেয়াল করি নি!"

অপর একজন বলিল, "তার ওপর উনিও আবার নিজের ওভারকোটটা চাপিয়ে দিলেন; ওর হয়ে গেল পোয়াবারো।"

তৃতীয় একজন বলিল, "চাপিয়ে না দিয়ে উপায় আছে? ওর যে মস্ত বড় একটা লাভের যোগ যাচ্ছে। সবাইকে হাতের কাছে জুগিয়ে দিতে হবে না?"

অতুলদা নিতান্ত সাদাসিধা প্রকৃতির লোক, কোন কথা কি ভাবে দাঁড়ায় অতটা হিসাব রাখেন না, বলিলেন, "গেল বটে থোক টাকা একটা, কিন্তু সার্থক শিক্ষা তোমার লাহিড়ি!…চব্বিশ ঘণ্টাই বা কোথায় গো? এদিকে মুখ থেকে কথা বেরুল, আর ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে লাভ, একটি পয়সা খরচ নেই, একটু হাঁকুপাঁকু নেই, এক রত্তি দৌড়ঝাঁপ নেই! ধন্যি শাস্ত্র বাবা!…আর ও সমুদ্রযাত্রাও তোমার মিথ্যে বলা নয়, শেষ পর্যন্ত বেটার কপালে কালাপানি আছেই আছে!"

শখের বিপদ

জজসাহেবের কুকুর-অন্ত প্রাণ। টেমীর যে বাচ্ছা হইয়াছে এইটেই আজকের সবচেয়ে বড় খবর তাঁহার মুখে; যাহার সহিত দেখা হইতেছে, তাহাকেই কথাটা একবার শুনাইয়া দিতেছেন।

মুন্সেফ. বীরেশবাবু সান্ধ্যভ্রমণে আসিয়া খবরটা শুনিয়া অতিমাত্র পুলকিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বলেন কি! টেমীর বাচ্ছা হয়েছে?"

জজসাহেব বলিলেন, "আজ সকালে। কথার ভাবে মনে হচ্ছে, আপনিও কুকুরের বড় ভক্ত। কই এ কথা জানতাম না তো!"

বীরেশবাবু বিগলিত হইয়া বলিলেন, "কুকুর আমার প্রাণ স্যার্! আর ও-রকম প্রভুভক্ত, আর—কি যে বলে…"

"—ইণ্টেলিজেণ্ট্। তা বুদ্ধির কথা যদি বললেন, টেমীর মতো শার্প, কুকুর দেখাই যায় না; ওর পেডিগ্রীটা একেবারে নিখুঁৎ কিনা,—তাহ'লে আপনাকে দেখাই…বয়, টেমীকা পেডিগ্রী-চার্ট হাজির করো।"

টেমীর কৌলিন্য-পঞ্জী দেখিয়া বীরেশবাবু বিস্ময়ে হাঁ করিয়া রহিলেন। বলিলেন, "মাই গড্! কখন এরকম দেখিনি!"

কথাটা সত্য এক দিক দিয়া; অর্থাৎ কুকুরের যে আবার কুলজি হয়, সে কথাটা শোনা থাকিলেও সাক্ষাৎ জ্ঞান এই প্রথম। কুকুর জিনিসটাকে তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারেন না, এবং যতটা ঘৃণা করেন, তাহার চেয়ে বেশি ভয় করেন। পথে-ঘাটে তাহাদের নিয়ত চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাই যথেষ্ট; তাহার উপর তাহাদের কুলজি হাতড়াইবার

কখনও বাসনা হয় নাই! তবু জজসাহেবের কুকুর, তাহাতে আবার নবজাত শিশু, যাহাদের আদিপুরুষ একদিন সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের দরবার অলংকৃত করিয়াছিল; অন্তরের সব ঘৃণা-বিতৃষ্ণা চাপিয়া পুলকে বিস্ময়ে মুখব্যাদন করিতেই হয়।

বরং প্রশংসার পর যে আর একটা কথা না বলিলে বড় বেখাপ্পা হয়, সেটাও বলিয়া ফেলিতে হইল। বীরেশবাবু গভীর মিনতির স্বরে বলিলেন, "এমন জাতের কুকুরের লোভ সামলানো যায় না স্যার্; একটা আমার চাই, অবশ্য যদি অন্য কাউকেও কথা না দিয়ে ফেলে থাকেন..."

আশা ছিল, কথা দিয়া ফেলিয়াছেন; চাওয়ার ভদ্রতাটাও রক্ষা হইবে, অথচ পাওয়ার বিপদও ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে না। আশাটা ঠিকও; কিন্তু মুন্সেফবাবুর প্রশংসা শুনিয়া এবং আগ্রহ দেখিয়া জজসাহেব বলিলেন, "তিনটের কথা দিয়ে ফেলেছি আগেই; পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর সিভিল সার্জেনকে—তাঁর বউয়ের আবার ভারি শখ। কিন্তু আপনার..."

বীরেশবাবু দম বন্ধ করিয়া শুনিতেছিলেন, তৃপ্তির নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, "তবে থাক্, এবার আমার অদৃষ্টে নেই দেখছি। এর পর বাচ্চা হ'লে কিন্তু..."

জজসাহেব বলিলেন, "না, না, আপনার যখন এত শখ, তখন নিজের জন্য যেটা রেখেছি, সেইটাই দোব আপনাকে, এত ভালোবাসেন যখন আপনি...কুকুরের শখ যে কি তা তো আমার জানা আছে মশাই।"

মুন্সেফবাবু মুখের হতাশ ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, সাংঘাতিক শখ স্যার্। বলেন কেন আহার-নিদ্রা ভুলিয়ে দেয় একেবারে!

আহার-নিদ্রা সেই রাত্রি হইতেই ভুলিতে হইল। কুকুরের প্রতি

ব্যক্তিগত অনুরাগের অভাব ছাড়া আর একটি গুরুতর কারণ ছিল। কুকুর গৃহিণীর দুচক্ষের বিষ। এইখানেই শেষ হইলে বরং উপায় ছিল; তিনি আবার যে কুকুর পোষে, তাহাকে পর্যন্ত দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না। গৃহিণীর সঙ্গে কোন বিষয়েই মতের মিল না থাকায় বীরেশবাবুর দাম্পত্য জীবন তেমন সুখের নয়। তবু ওরই মধ্যে ভগবান ঐটুকু যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছিলেন, উভয়ের এই কুকুর-বিদ্বেষ: কতদিনের কত বিষয়ের মনো-মালিন্য এই কুকুরের কথা তুলিয়া কাটিয়া গিয়াছে। এই সে-দিনকার কথাই ধরা যাক্।—

সাতদিন কথাবার্তা বন্ধ। সন্ধ্যার সময় মুন্সেফবাবু বাড়ি ঢুকিয়া খানসামাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সদানন্দ, পেণ্টালুনটা কেচে টাঙিয়ে দে, কুকুরে চেটে দিলে।"

গৃহিণী তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া ভীতভাবে প্রশ্ন করিলেন "কার কুকুর রে সদানন্দ?"

সদানন্দ নির্লিপ্তভাবে মনিবের মুখের দিকে চাহিল। তিনি তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিলেন, "অত ভয় পাবার কি আছে? রাস্তার কুকুর নয়, পুলিশ সাহেবের কুকুর, রোজ দুবেলা চান করছে···

সদানন্দ কর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। তাঁহার রাগটা পড়িয়া যাওয়ায় তিনি মনোমালিন্যের কথা ভুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়াই প্রশ্ন করিলেন, "তাই সে ভাটপাড়ার গোঁসাইঠাকুর হয়ে গেল?"

মুন্সেফবাবু স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই তো কেচে দিতে বললাম।"

"শুধু জল কাচা করে দিলে চলে? ও পেণ্টালুনের আর জাত আছে? আর শুধু পেণ্টালুনের কথা যে বলছ, জামাটা? সেটা বুঝি শুদ্ধ, আছে? মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কি কিছুই নেই?

মধ্যস্থতার প্রয়োজন নাই দেখিয়া সদানন্দ সরিয়া পড়িয়াছিল।

মুন্সেফবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে হাঁকিয়া বলিলেন, "কোথায় গেলি ? তাহলে বাথরুমে জল দে।"

স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ, যেন সমস্ত শরীরটা ঘিনঘিন করছে ; হোব্বা-চোব্বাগুলো ছেড়ে চান করে নেওয়াই ভালো।"

"হ্যাঁ, এই অবেলায় চান করে কাৎ হয়ে পড়ো। তোমার আর কি ! ভুগতে তো সেই আমিই···গঙ্গাজল দিচ্ছি, ওগুলো ছেড়ে একটু মাথায় দাও।···মুখপোড়ারা কুকুর পোষে তো বেঁধে রাখেনা কেন ?"

"ঠিক, গঙ্গাজলই দাও একটু। তোমার মাথায় বেশ চট করে আসে, না হ'লে এক্ষুনি চান করে মরতে হ'ত আর কি !"

খোসামোদের পর সাহস পাইয়া একটু রসিকতাও করিলেন, "এ সাতটা দিন যা কেটেছে আমার, একটু শান্তিজলের দরকারও।"

সেই কুকুর এখন একেবারে বাড়ি আসিয়া উঠিতেছে। অকস্মাৎ নয়, জানিয়া-শুনিয়া আদর-আপ্যায়ন করিয়া তাহাকে আনিয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। জজসাহেব ওটা নিজের জন্য আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন, শুধু মুন্সেফবাবুর আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে দিয়াছেন, কথাটা জানাজানি হইতে বিলম্ব হইবে না। তাহার পরের অবস্থা কল্পনারও অতীত।

মহা দুশ্চিন্তা ও অশান্তিতে দিন কাটিতে লাগিল। তিন চার দিন আর জজসাহেবের বাড়ি গেলেন না, কোর্টেও এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। তাহার পর একদিন এজলাস হইতে নামিবার সময় সিঁড়িতে অতর্কিতে দেখা হইয়া গেল। বলিলেন, "ক'দিন আসেন নি যে বীরেশবাবু ?···বাই দি বাই, আপনার কুকুরটা যা হয়েছে—It's a love ! ঐটেই সবচেয়ে ভালো দাঁড়াবে। কাল সিভিল সার্জেন ডেভিড্‌স এসেছিল। বলে, 'এটা আমায় দাও মিস্টার চৌধুরী, আমি মুন্সেফ মিস্টার

মিটারকে বলে দোব।' বললাম, 'I am afraid, he would be the last man to part with it (তিনি কোন মতেই হাতছাড়া করবেন বলে ভরসা হয় না)। কুকুরে তাঁর ভীষণ শখ, আবার তাঁর চেয়ে মিসেস্ মিটারের শখ আরও বেশি।'—আপনার স্ত্রীর নামটা ঢুকিয়ে দিয়ে ভালো করি নি? হ'তেন রাজি আপনি?"

বীরেশবাবু যেন শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "রাজি স্যার্! বলে, কবে আপনার ওখান থেকে নিয়ে আসব বলে দিন গুনছি।…"

সেদিন—সে দুর্দিন ক্রমেই আগাইয়া আসিতেছে। যখন উপায় নাই, তখন বিপদের সম্মুখীন হওয়াই ভালো। প্রথম হইতে জমিটা তৈয়ার করিয়া রাখা দরকার, আনিতে যখন হইবেই। তাহার পর অদৃষ্টে যাহা থাকে! বিপদের গভীরতারও একটা আন্দাজ করিয়া রাখা ভালো।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া রাত্রে আহারের সময় কথাটা পাড়িলেন. প্রায় শেষের দিকে, অনেক কুণ্ঠাকে আহারের সঙ্গে গলার নিচে ঠেলিয়া নামাইয়া।

প্রথমটা নিজের মনেই 'হুঁঃ' করিয়া একটু হাসিলেন। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ হাসি হ'ল যে?"

"আজ জজসাহেবের কি হয়েছে, জবরদস্তি একটা কুকুরের বাচ্ছা গছাতে চায়। কিছু বলতেও পারি না, অথচ…"

আধচাওয়া করিয়া মুখের পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

গৃহিণী হাতের পাখা নামাইয়া আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "সেকি! কুকুর বাচ্ছা নিয়ে কি হবে? কি জ্বালা!"

"শেষ পর্যন্ত বললামও তাই, 'সেকি, কুকুর বাচ্ছা নিয়ে কি করব মশাই? এযে আপনার অদ্ভুত কথা!' কিন্তু…"

"আবার কিন্তু কি ?"

"এই যে তোমরা বেশ বলো—চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী, বলে, 'না, কুকুর একটা রাখুন বীরেশবাবু; ইংল্যাণ্ডের রাজার বাড়ির কুকুর—যেমন তেজী, তেমনই সুন্দর, তেমনই···"

হঠাৎ মুখের দিকে নজর পড়ায় থামিয়া গেলেন। গৃহিণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কথাবার্তার গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন, বলিলেন, "কুকুর আবার সুন্দর! তা যদি সুন্দরই হয় তো যাদের সুন্দর তাদের কাছেই থাকুক না, আমাদের ঘাড়ে চাপানো কেন ?"

"সেই কথাই তো বললাম কিনা পাকে-চক্রে, বললাম, ওসব জাতের কুকুর আপনাদের আই-সি-এসদের ঘরেই মানায় স্যার, আমরা হ'লাম···' কিন্তু এড়ানো কি যায় ? বলে··"

গৃহিণী পাখার বাঁটটা সোজা করিয়া মাটিতে বসাইয়া বলিলেন, "এড়াতে পারলে না ? বলো কি ! বাড়িতে তা হ'লে কুকুর ঢুকছে ! ভাঁড়ারঘর, রান্নাঘর, পূজোর ঘর···"

"এড়িয়ে এলাম বই কি ! হাজার আই-সি-এস্ হ'লেও, আমাদেরও তো উকিল চরিয়ে চরিয়ে দাড়ি-চুল পাকানো। এড়িয়ে তো এলাম আপাতত, তবে কথা হচ্ছে···জেলার জজ, একেবারে ওপরওয়ালা···"

গৃহিণী আর রাগটা চাপিতে পারিলেন না। গুছাইয়া বসিয়া মুখটা একটু বাড়াইয়া বলিলেন, "ওপরওয়ালা বলে কুকুর না পোষার জন্য মাথা নেবে ? এত ভয় কিসের ? মগের মুল্লুক নয় তো। আর যদি সেই ভয়ই থাকে তো বদলি তো হচ্ছই ক'মাস পরে, না-হয় আরও শীগ্‌গির বদলির জন্য দরখাস্ত করো। তাতেও না হয়, ইস্তাফা দাও চাকরিতে। তিনটে লোকের পেট তো! মোট কথা, কুকুর এবাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে পারবে না।"

বোঝা গেল। কিন্তু কথা হইতেছে—বুঝিয়াই বা ফল কি? কুকুর যে আনিতেই হইবে। জজসাহেবের কুকুরের প্রবল শখ; সেই শখকে দমন করিয়া তিনি নিজের জন্য আলাদা করিয়া রাখা কুকুরটি দিয়াছেন;—একজাতীয় আত্মোৎসর্গ। স্বীকার করিয়া আসা হইয়াছে—কুকুর তাঁহার নিজের প্রাণ, গৃহিণীর প্রাণের চেয়েও অধিক।

অথচ গৃহিণী ত্রিসীমানার মধ্যে আসিতে দিবেন না। এদিককার অবস্থা এই।

ওদিকে আবার লইয়া আসিতেও প্রবল বাধা, বোধ হয় যেন প্রবলতর। বাধাটা স্বয়ং টেমীর পক্ষ হইতে।

পরের দিন বীরেশ বাবু বৈকালে জজসাহেবের বাড়ি গেলেন। মনে যে খুব উৎসাহ বহন করিয়া গেলেন এমন নয়, তবে বারান্দায় পা দিয়াই মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "আর বলবেন না, যা ঝঞ্ঝাটে পড়া গিয়েছিল।···কই, আমার বাচ্ছার খবর কি? মানে, আপনার টেমীর বাচ্ছার?"

জজসাহেব বলিলেন, "খবর খুব ভাল। চলুন না, একবার দেখে আসবেন। গায়ের রোঁয়াগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে আসছে, তাইতে রংটাও খুলছে দিন দিন। আপনারটা দাঁড়াচ্ছে—গায়ের রং তামাটে, ডীপ চকোলেট; মাথায় একটা স্টার—সিম্‌প্লি বিউটিফুল! না মশাই, শেষ পর্যন্ত যে আপনাকে প্রাণ ধরে দিতে পারব, এমন মনে হচ্ছে না।"—শেষের কথাগুলা বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

একটা সুবর্ণসুযোগ। হাসির উপরই বেশ বলা চলিত, "তা নিন্ না স্যার্; আপনার অত পছন্দসই জিনিস, নিয়ে শাপমন্যি কুড়ব?

বোধহয় হাসিটার উপরই ফাঁড়াটা কাটিয়া যাইতে পারিত; কিন্তু তাহা তো বলা হইলই না, বরং মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া হাসিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তা হ'লে আমি কুকুরের জন্যে ধন্না দিয়ে পড়ব স্যার্,

আমরা কর্তা-গিন্নী দু'জনেই। তাঁর যদি আবার ঝোঁক দেখেন; বলেন…"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে কেনেলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একটি হাত-আড়াইয়ের নিচু খাট, তাহার উপর একটা গদি, গদির উপর একটা পরিষ্কার কালো কম্বল পাট করিয়া বিছানো। তাহার উপর বাচ্ছা-চারিটিকে কোলে পিঠে রাখিয়া টেমী কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। জজসাহেবকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া একবার ঝাঁকড়া লেজটি নাড়িয়া দিল। একটিকে দেখাইয়া জজসাহেব বলিলেন, "ঐটি আপনার বীরেশবাবু। What do you think of it? (কি মনে হয়)—চমৎকার নয়?"

সত্যই চমৎকার। কাদার ডেলার মত নধর গা; ছোট্ট কান দুইটি, আর পিঠের মাঝখানে চুল একটু কুঞ্চিত। বীরেশবাবু পুলকিত হইয়া বলিলেন, "আমার তো আজই নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।…টেমী, তোর বাচ্ছাকে নিয়ে চললাম আজই।"

টেমী নিজের নাম উচ্চারণে মাথাটা একবার তুলিল, এবং মুন্সেফ-বাবুর দিকে চাহিয়া 'গঁ-অ-অ' করিয়া একটা অসন্তোষব্যঞ্জক টানা শব্দ করিল!

বীরেশবাবু এমন কিছু কাছে যান নাই, তবুও দুই পা পিছাইয়া আসিলেন। কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "আপত্তি তোর শুনছে কে?… বাঁধা আছে তো স্যার্?"

টেমী বুকে হাপরের মতো খানিকটা হাওয়া ভরিয়া লইয়া আবার খানিকটা একটানা শব্দ করিল।

জজসাহেব বলিলেন, "না, বাঁধা নেই; তবে কোন ভয় নেই আপনার। বাঁধলে চেন্‌টা বাচ্ছাগুলোর গলায় আটকে যেতে পারে কিনা। এমনই ওদের মাদার খুব সাবধান। দেখুন না, ডাকছি, আস্তে আস্তে কি-রকম সন্তর্পণে পা ফেলে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে উঠে আসবে,

পায়ের নখ পর্যন্ত না লাগে যাতে। ভয়ংকর ইণ্টেলিজেণ্ট্ জাত যে!... টেমী, ক্যম হিয়ার!"

মুন্সেফবাবু জজসাহেবের কাছে একটু ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "থাক্, আর ও-বেচারীকে ডেকে কাজ নেই। বাৎসল্য স্নেহ, ছেড়ে আসতে বেচারার কষ্ট হবে। আহা, অবলা জীব।...নখের কথা বললেন, নখ কুড়িটা, না আঠারোটা স্যার্?"

জজসাহেব হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আপনারও সে সুপারস্টিশান আছে নাকি?—বিশটা নখ থাকলে বিষ হয় কুকুরের? ওটা একটা নিছক গাঁজাখুরি। এই তো সেদিন ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের বেয়ারার পায়ে দাঁত ফুটিয়ে দিয়েছিল। He is as hale and hearty as ever (খাসা রয়েছে সে)!'

"তা হ'লে ভালো। চলুন, বেচারী বোধ হয় অস্বস্তি ফীল্ করছে আমারা দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে। শব্দটা থামাতে চাইছে না, দেখছেন, না? আহা, মায়ের প্রাণ তো!...না টেমী, তুই আগলা তোর বাচ্ছাদের; তবে আর দিনকতক পরে কোন ওজর-আপত্তি চলবে না, ইউ ডু?"

একটু ভুল হইয়া গিয়াছিল। শেষের কথাগুলি তর্জনী নাড়িয়া একটু বেশি হৃদ্যতা দেখাইয়া না বলিলেই ভালো ছিল। টেমী বাচ্ছাগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া একেবারে 'ঝাঁউ ঝাঁউ' করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। জজ-সাহেব সঙ্গে সঙ্গে "পীস্, টেমী!" বলিয়া ধমক দিয়া উঠিতে আবার মুখ নিচু করিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া বাচ্ছাগুলার গা চাটিতে লাগিল। বীরেশবাবু অবশ্য তখনও জজসাহেবের পিছনে দাঁড়াইয়া হাসিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু সে হাসি কোন রকমে ঠোঁট দুইটাকে জবরদস্তি দুইদিকে টানিয়া রাখা মাত্র—একটা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা।

জজসাহেব বলিলেন, "দেখুন, এ একটা স্টাডি করবার জিনিস। অন্য

সময় আপনি এলে আপত্তি করত না। এখন ও কতকগুলো ঘটনা মিলিয়ে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করে নিয়েছে।—'এ লোকটা পূর্বে কখনও এদিক পানে আসে নি, আজ হঠাৎ এসেছে, আর আমার বাচ্ছাগুলোর সম্বন্ধেই এদের জল্পনা হচ্ছে, সুতরাং এ আমার বাচ্ছা না নিয়ে যায় না; সুতরাং একে সন্দেহের চক্ষেই দেখা উচিত।' দেখুন আপনার দিকে একটু মুখ তুলে আড়চোখে চাওনাটা একবার দেখছেন তো? একে স্প্যানিয়েল জাতের কুকুর, তাতে টেমীটা আবার এত শার্প যে, বোধ হয় প্রত্যেক কথাটি বুঝতে পারে।···সাইলেন্স্, টেমী! চুপ করে শুয়ে থাক্।···চলুন, যাওয়া যাক্।"

যাইতে যাইতে একবার ঘুরিয়া, দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বীরেশবাবু অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "শালা নৈয়ায়িক!"

অত্যন্ত চিন্তিতভাবে, সমস্যা সমাধানের হাজার রকম উপায় খুঁজিতে খুঁজিতে বীরেশবাবু বাড়ি-মুখো হইলেন।

টেমীর বাচ্ছা আসিয়া পড়িল বলিয়া, কোন রকম উপায় নাই। কথাটা আবার আজ কোনরকমে পাড়িতেই হইবে। মনে মনে মহলা দিতে লাগিলেন। বলিবেন, কোনমতেই ছাড়িলেন না জজসাহেব, আজ আবার তাঁহার স্ত্রীও যোগদান করিলেন। বেটাছেলের কথা ঠেলা যায়, ঠেলিয়াছিলেনও, কিন্তু স্ত্রীলোক—হিন্দুশাস্ত্রে বলে, স্ত্রীলোক আদ্যাশক্তির রূপ।··· বাস্, ঠিক মনে পড়িয়াছে!—হাসিয়া স্ত্রীজাতির প্রশংসা করা, এই এখন একটিমাত্র উপায়। স্ত্রীজাতি আদ্যাশক্তির অংশ, করুণার অবতার, বিশেষ করিয়া শিশু সম্বন্ধে। খুব কথাটা পাওয়া গিয়াছে—শিশু! মানুষের শিশুই হোক্ বা অবুঝ পশুর শিশুই হোক্, স্ত্রীজাতির সমভাব, দুই বাহু বাড়াইয়া স্থান দেন, আদ্যাশক্তি যে!

বাহিরের বারান্দায় উঠিতেই দেখিলেন, চাকর কাঁধে একঘড়া জল লইয়া সদর দরজা দিয়া বাড়িতে গেল। পূর্ণ কলস দেখিয়া মনটাও প্রসন্ন হইল।

ভিতরে গিয়া দেখেন—প্রলয় কাণ্ড! চাকর কলসির জলটা তাঁহার শয়নকক্ষের মেজেয় হুড়হুড় করিয়া ঢালিতেছে। ঝি সেটাকে ঝাঁট দিয়া ছড়াইয়া সমস্ত ঘর পরিষ্কার করিতেছে। রান্নাঘরের সমস্ত তৈজসপত্র উঠানে বিশৃঙ্খলভাবে ডাঁই করা। বারান্দা ধোওয়া হইয়াছে, জল শপ্ শপ্ করিতেছে। এক কোণে কতকগুলা মাদুর, আসন, বালিশ, দুয়ারের পর্দা গাদা করা। গৃহিণী কাঁধে একটা গামছা ফেলিয়া, দুই কোমরে হাত দিয়া তদারকে দাঁড়াইয়া। রাগে মুখে একটি কথা নাই; কাপড়ের রাঙা পাড়ে, চুড়ি আর ঝিকমিকিনিতে, কাঁধের রাঙা গামছায় একটা যেন অধূম অগ্নিশিখা!

মুন্সেফবাবু দোরগোড়া হইতেই নিঃশব্দে পিছনে হাঁটিয়া বাহিরে আসিলেন। খবর পাইলেন, ইনকাম-ট্যাক্স অফিসারের স্ত্রী, আর পুত্রবধূ বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, সঙ্গে একটি নিরতিশয় চঞ্চলপ্রকৃতির অনুসন্ধিৎসু কুকুরশাবক লইয়া।

সে রাত্রে গৃহের শৈত্য এবং গৃহিণীর উত্তাপের মাঝে পড়িয়া আদ্যাশক্তির গুণগান করা এবং সেই সঙ্গে কুকুরের কথা উত্থাপন করা সম্ভব হইল না।

পরের দিন সকালে টেমীর বাচ্চা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাত্রে ক্লাবে ডেভিড্‌সনের স্ত্রী স্বয়ং ধরিয়াছিল। মুন্সেফবাবুকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া জজসাহেব ফাঁড়াটা কাটাইয়া দেন এবং পরের দিন বাচ্ছাটা মুন্সেফবাবুর বাড়ি প্রেরণ করেন; মুন্সেফবাবুর স্ত্রীর খাতিরেই মিথ্যা কথাটা তিনি বাড়াইয়া বলিয়াছিলেন।

সেই দিন দুপুরের গাড়িতেই মুন্সেফবাবুর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, এজন্মে আর ফিরিবেন না, মুন্সেফবাবু কুকুর লইয়াই থাকুন।

বাচ্ছাটার নাম হইয়াছে 'জলী'; জজসাহের নিজে রাখিয়াছেন।

সার্থকনামা কুকুর, যেমন আমোদপ্রিয়, তেমনই চনমনে। আমোদের সন্ধানে প্রথম সুযোগে বাড়ির প্রত্যেক জিনিস পরখ করিয়া ফিরিয়াছে, টেবিলের উপর দোয়াতের কালি হইতে আরম্ভ করিয়া। সদানন্দ তাড়াতাড়ি শিকল কিনিয়া আনিয়া জলীকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং সমস্ত বাড়িটা আর একবার ভালো করিয়া ধুইয়া লইল।

জজসাহেবের বেহারা চাঁদু বৈকালে তত্ত্ব লইতে আসিয়া সদানন্দকে বলিল, "অমন কাজ কোরো না, অত বাচ্ছা কুকুরকে কি বেঁধে রাখে?"

তাহার পর হইতে জলী যথা অভিরুচি বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এখন ধোওয়া-মোছা করিতে গেলে আর কলসীর জলে কুলাইবে না, একটি প্লাবনের দরকার। সেটা মুন্সেফবাবু আর সদানন্দ উভয়েরই মনঃপূত; কেন না, তাহাতে জলীরও অস্তিত্ব লোপ পায়; কিন্তু সে শুভ সম্ভাবনা কোথায়?

টেমীর সমস্ত সন্তানগুলি বিলি হইয়া গিয়াছে। ঝাড়া-হাতপা হইয়া সে এখন সন্ধান লইতেছে, কোন্‌টি কোথায় উঠিল। প্রথম দুইটির সন্ধান পাইয়াছে। তৃতীয়টিকে কোলে লইয়া সিভিল সার্জেনের স্ত্রী মোটরে করিয়া তাহার মার সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসেন। বাচ্ছাটা সুখেই আছে। টেমীর মনে খেদ নাই; কেন না, কুকুরকে যে পরের জন্য প্রসব করিতে হয়, অদৃষ্টের এ-বিধানটা কয়েক বারের অভিজ্ঞতায় সে একরূপ মানিয়াই লইয়াছে। কিন্তু ছোটটির—কন্যাটির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; এবং টেমীর ঘোর সন্দেহ—কাঁচা-পাকা বড় বড় গোঁফওয়ালা, লিকলিকে শরীরের যে লোকটি প্রায়ই আসিয়া কপালের ঘাম মুছিতে থাকে, কখন কখন কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া তাহার সহিত নির্ভীক ভাবে কথা বলিবার চেষ্টা করে,—বেশ বুঝা যায় তস্করের স্বভাব অনুযায়ী ভিতরে ভিতরে খুব ভয়—এ তাহারই কাজ। লোকটাকে সে তাহার সহজ শ্বা-বুদ্ধিতে প্রথম

হইতেই সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছে। কিন্তু উপায়? কি করিয়া দুর্বৃত্তের হাত থেকে কন্যাটিকে উদ্ধার করা যায়?

জলী আসিবার প্রায় সপ্তাহখানেক পরে মুন্সেফবাবু একদিন জজ-সাহেবের বাড়ি আসিয়াছিলেন। জলীর আসা পর্যন্ত মনে একেবারেই শান্তি নাই; অথচ জলীকে লাভ করায় তাঁহার হর্ষের আর সীমা নাই, দেখাইতে হইবে এই রকম একটা ভাব। সেইটাই আয়ত্ত হইতেছিল না। আজ সাত-পাঁচ ভাবিয়া আসিয়া পড়িয়াছেন।

গল্পসল্প হইতেছে—হ্যাঁ গৃহিণী একরকম হঠাৎই গেলেন বই কি। টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির, তাঁর ভগ্নীর কঠিন অসুখ, সেই দিনই বড় শালা আসিয়া উপস্থিত। চলিয়া যাইতে হইল। জলীটার জন্য সে কি কান্না! মেয়েমানুষের মন কিনা, একটুকুতেই মায়া বসিয়া যায়, তায় আবার একেবারে কুকুর-অন্ত প্রাণ!···

টেমী কোথায় ছিল, আসিয়া উপস্থিত। বেশ দৌড়াইয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে আসিতেছিল, মুন্সেফবাবুকে দেখিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। লক্ষ্য করিয়া কি দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া জুতাটা শুঁকিল, ডান হাঁটুটা শুঁকিল, তাহার পর পিছনে গিয়া এখানে ওখানে এবং চেয়ারের পায়া দুইটা আঘ্রাণ করিয়া সামনে আসিয়া বসিল।

মুন্সেফবাবু হাত-পা গুটাইয়া একেবারে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন, বিশেষ করিয়া টেমী যতক্ষণ পিছনের দিকটায় ছিল। সামনে আসিয়া বসিলে প্রসন্নভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "টেমী, কদিন আসি নি, ভুল গেছলি নাকি?"—গায়ে হাত দিয়া বলিতে যাইতেছিলেন, কি ভাবিয়া আর অতটা আত্মীয়তা করিলেন না।

জজসাহেব ধীরে ধীরে হাসিতেছিলেন, বলিলেন, "আপনি ওর মতলবটা ধরতে পারেন নি। ও যা করলে, এইটেই এই জাতের স্প্যানিয়েলের বিশেষত্ব। এরই জোরে এর একটা কাজিন্ প্যারিস পুলিসে

একটা পাকা গোয়েন্দার কাজ করছে ; বড় বড় কেসে ইন্‌-ডিস্পেন্সেবল্‌ (না-হ'লেই নয়)।...ও আপনাকে ভালো করে শুঁকে-টুকে ঠিক করে ফেললে, আপনি ওর ছানাটি রেখেছেন। আঘ্রাণশক্তির এত সাট্‌ল্‌টি (সূক্ষ্মতা) আমরা মানুষেরা কল্পনাও করতে পারি না। আপনার গায়ে ও ছানার—যেটি আপনার ওখানে রয়েছে,—সেই ছানাটির গন্ধ পেয়েছে। Their memory is in their sense of smell (ওদের স্মরণশক্তি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে); আশ্চর্য কথা নয়?"

বীরেশবাবু টেমীর উপর দৃষ্টিটা সতর্কভাবে নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, প্যারিসের ক্রিমিনালেরা এক কাজ করলেই পারে, যাতে ক্রাইমের গন্ধ লেগে আছে এমন সব কাপড়চোপড় সরিয়ে ফেললে, কিংবা ভালো করে ধুইয়ে ব্যবহার করলে তো আর এদের ঘ্রাণশক্তিতে কুলুবে না?"

এর প্রমাণ পর দিন হাতে হাতে পাওয়া গেল। ধোপদস্ত চোগা, চাপকান, টুপি পরিয়া কোর্টে গিয়াছেন, উপরের বারান্দায় উঠিতেই মনে হইল, যেন পিছনে গোড়ালিতে কি-একটা ঠেকিল। ফিরিয়া দেখিতেই চক্ষু চড়কগাছ—টেমী!

টেমী এখানে কোথা হইতে আসিল! মনে পড়িল, ছানা হইবার পূর্বে টেমী মাঝে মাঝে জজসাহেবের সঙ্গে কাছারিতে আসিত। তা আসিত বটে, কিন্তু তখন তো এ রকম পিছু লইত না। চুপচাপ এজলাসের একপাশটিতে বসিয়া থাকিত। আজ তবে এ ভাবান্তর কেন? সত্যই কি তবে পরিচ্ছদে বাচ্চার গন্ধ পাইয়াছে? কিন্তু এসব তো আজই বাক্স থেকে বাহির করিয়াছেন।

না, আদর করিতে সাহস হয় না, অগ্রসর হইতে পা উঠে। দাঁড়াইয়া

দাঁড়াইয়া গলদ্‌ঘর্ম হইতেছিলেন, চাঁদু বেয়ারা আসিয়া টেমীকে ধরিয়া লইয়া গেল।

তাহার পর কাজকর্মের ভিড়ে ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রবলবেগে মকদ্দমা চলিতেছে, সাক্ষীদিগের জবানবন্দি লিখিতে লিখিতে আর মাথা তুলিবার অবসর নাই। উহারই মধ্যে একবার উকিলকে কি একটা প্রশ্ন করিবার জন্য মুখ তুলিতেই একেবারে নিশ্চল হইয়া গেলেন। বাহিরের বারান্দায়, ঠিক দুয়ারের সামনে তাঁহার সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া টেমী। থাবায় মুখ দিয়া তাহার অভ্যস্ত রীতিতে বসিয়া ছিল, তিনি মুখ তুলিয়া চাহিতেই সামনের পায়ে ভর দিয়া সোজা হইয়া বসিল।

মুন্সেফবাবু সম্মোহিতের মতো চাহিয়া রহিলেন। সেইভাবেই একটু পরে উকিলকে প্রশ্ন করিলেন, "হুঁ, কুকুরছানার কথা কি বলছিলেন?"

"কুকুরছানার কথা নয় স্যার্, বলছিলাম, কচি ছেলের এতটা বুদ্ধি হবে না যে..."

মুন্সেফবাবুর চমক ভাঙিল। আঙুল দিয়া কপালের ঘাম ঝাড়িয়া বলিলেন, "ও, হ্যাঁ, মানুষের ছেলের কথা বলছিলেন।...গরম একটু বেশি পড়েছে যেন।...তা বুদ্ধির ডেভেলপ্‌মেণ্টের (বিকাশের) কথা কিছুই বলা যায় না।"

"—তবু একটা সীমা আছে স্যার্, ধরুন..."

দৃষ্টি আপনি বাহিরে গিয়া পড়িল। মুন্সেফবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে, না মশাই, সীমা নেই, আপনারা জানেন না।"

বাহিরে বেশ একটু ভিড় জমিয়া গেছে। আদালতে যে ভিড় দেখা যায়, তাহার একটা মোটা অংশ উদ্দেশ্যহীন। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া আসিয়া বিনা পয়সায় এজলাসে এজলাসে বিচারের তামাসা দেখিয়া বেড়ায়। আজ একটু নূতনত্ব হইয়াছে। জজসাহেবের কুকুর মুন্সেফ-সাহেবের বিচার শুনিতেছে। তাই ভিড় বেশ একটু চাপ। আরদালী

মাঝে মাঝে আসিয়া সরাইয়া দিতেছে, আবার জমা হইতেছে, পুকুরে পানা সরাইয়া দিলে আবার যেমন কেন্দ্রমুখী হইয়া আসিয়া জমা হয়।

এজাহার লইতে গোলমাল হইতেছে। চোখ তুলিলে বারান্দায় কুকুর, চোখ নামাইয়া কাগজে নিবদ্ধ করিলে কুকুর আসিয়া একেবারে যেন কাগজে জাঁকিয়া বসিতেছে; যাহা লিখিতেছেন, সব যেন হইয়া যাইতেছে টেমীর নখ, লেজ, কোঁকড়ানো চুল, লটকানো দুইটা কান, সবের মাঝে দুইটা লুব্ধ দৃষ্টি—রক্তলুব্ধ। কি অসহ্য অবস্থা!

জজসাহেবের আরদালী আসিয়া আবার টেমীকে টানিয়া লইয়া গেল। যাইতে কি চায়? যাইতে যাইতেও ঘুরিয়া দৃষ্টিক্ষেপ। ভাবটা—'ও এজলাস থেকে একবার নেমে আসুক, বাচ্ছা পোষার শখ ওর ঘোচাচ্ছি।'

সেই দিন সন্ধ্যার দিকে মুন্সেফবাবু জজসাহেবের বাংলায় উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সদানন্দ, তাহার কোলে বেশ একটি মোলায়েম ধপধপে তোয়ালেতে জড়ানো টেমীর বাচ্ছা জলী। জলীর গায়ে জরির পাড়-বসানো বেশ দামী পুরু মখমলের একটি জামা, গলায় খুব সৌখীন একটি কলার, মাঝখানে একটি রূপার ঘুঙুর ঝুলিতেছে।

জজসাহেব বলিলেন, "আসুন বীরেশবাবু. কদিন আসেন নি একেবারে? ···বাঃ, জলীটা তো খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। উঃ, জামায় গয়নায় যে একেবারে···"

তৈয়ারি হইতে আর বাধা কি? সমস্ত বাড়িটায় একাধিপত্য করিতেছে। মুন্সেফবাবু মুখটা বিষণ্ণ করিয়া বলিলেন, "তোয়ের তো হয়েছে স্যার্, সেবা-যত্নের তো কসুর করি নি, কিন্তু সবই বৃথা হ'ল।"

জজসাহেব বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন, কি হ'ল আবার?"

"সেই ব্যাপার, আপনি তো জানেনই। সিভিল সার্জেনের বউয়ের ভয়ে আমার ওখানে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন তো? কাল ঠিক ধরেছে,

—'মুন্সেফবাবু, আপনার বাচ্ছাটাই সবচেয়ে ভালো দাঁড়ালো দেখছি ; আমি জজসাহেবকে বলেওছিলাম ; কিন্তু তিনি নাকি আপনাকে কথা দিয়ে ফেলেছিলেন। Oh ! I'd give my life for it ; *what* a love ! (কি সুন্দর, এর প্রতিদানে জীবন পর্যন্ত দেওয়া যায় !)···বলুন, চাওয়ার কি আর এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষা আছে ? তখন বলতে হ'ল···"

"দিয়ে দিলেন ?"

"উপায় কি ?"

সদানন্দর কোলে জলীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বড় মায়া বসে গিয়েছিল। বিশেষ করে সে এলে যে কি বলব !"

জজসাহেব বলিলেন, "কুকুরের বিষয়ে এ জাতটা বড় লোভী মশাই··· তা, তার নিজেরটা আপনাকে দিচ্ছে তো ?"

মুন্সেফবাবুর এ-সম্ভাবনাটা মনে উঠে নাই, একটু হকচকিয়া গেলেন। তখনই সামলাইয়া বলিলেন, "কোথায় আছেন আপনি ? বলবার আগেই সে-পথ মেরে রেখেছে, ঝানু মেয়েমানুষ !···'আপনি যে এতটা স্বার্থত্যাগ করলেন, তার জন্য ধন্যবাদ মিস্টার মিটার ; আমার কুকুরের সঙ্গে চমৎকার পেয়ার হবে !'—নিন, এর ওপর অদলবদল করার কথা তুলতে পারেন ? আমাদের চোখে পর্দা আছে, ওদের মতন তো নয় ? বললাম, 'অনেকদিন ওর মাকে দেখেনি। একটা রাত থাক্ মায়ের কাছে। কাল জজসাহেবের আরদালী আপনার কাছে দিয়ে আসবে ম্যাডাম্।'···কই, টেমী কোথায় ? এই যে, নাম করতেই উপস্থিত। নে টেমী, তোর বাচ্ছা।···নামিয়ে দাও, সদানন্দ।···খুশি হ'লি তো টেমী ? কেমন জামা দেখ, রূপোর ঘুঙুর ! আর যেখানে সেখানে অমন করে···'.

সামলাইয়া জজসাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সিভিল সার্জেনের বউয়ের কাছে আর কথাটা, তুলবেন না স্যার্, লজ্জিত হয়ে পড়বে !

আমার অদৃষ্টেই যখন ছিল না কুকুরটা, তখন আর ও-বিষয় নিয়ে উচ্চবাচ্য করে ফল কি ?···আবার কবে বাচ্ছা দিচ্ছে টেমী ?"

"আবার বছরখানেক পরে।

মাস পাঁচ ছয়ের মধ্যেই বদলী হইবার কথা। একটা নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস মোচন করিয়া মুন্সেফবাবু বলিলেন, "অতি অবিশ্যি করে আমার জন্যে একটার কথা বলা রইল স্যার। এবার যেন ফাঁকি না পড়ি !"

দৈনিক

রাতারাতি একজন আত্মত্যাগী বীর হইয়া পড়িয়াছি।

ব্যাপারটা নিতান্ত আকস্মিকভাবে ঘটিয়া গেল। সামান্য বিলম্বের জন্য পারের স্টীমারটা হাতছাড়া হইল। দুই ঘণ্টা বসিয়া না থাকিয়া নৌকাতেই যাওয়া স্থির করিলাম। প্রায় জন আষ্টেক আরোহী হইলাম আমরা, তাহার মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। বৃদ্ধই বলা উচিত, তবে বয়স হইলেও বেশ সবল চেহারা। গায়ে নামাবলি, পায়ে কটকী চটি, হাতে মালা জপিবার একটি পুরাণো মখমলের ঝুলি। শুচিতা রক্ষা করিয়া এক দিকে একটু ধার ঘেঁষিয়াই বসিয়াছেন। দুই-একজন বলিল, তাহাতে মৌনভাবেই একটু হাস্য করিলেন মাত্র।

জোর ভাঁটার টান, পার হইতে সময় লইবে। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, বেশ একটি ঝিরঝিরে বাতাস উঠিয়াছে। এখানে ওখানে বীচিকুঞ্চিত গঙ্গাবক্ষে আলোর প্রতিবিম্ব দোল খাইতেছে। অভ্যাসের দোষে একটু ভাবের আবেশে পড়িয়া গেলাম। . একটু বাড়াবাড়িও হইয়া গেল,—নিচে সন্তুষ্ট না হইয়া একেবারে নৌকার ছইয়ের উপর গিয়া বসিলাম। যখন মাঝামাঝি আসিয়াছি এবং গুনগুনানির মধ্যে একটা গান স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, কোথা হইতে কি হইল বলিতে পারি না, নৌকাটা হঠাৎ একপেশে হইয়া গিয়া ছইয়ের পিচ্ছিল তেরপলের গা বাহিয়া নিচে পড়িয়া গেলাম। যখন সংবিৎ হইল, অনুভব করিলাম আমার হাতে একগোছা কাহার চুল, আর কে যেন দৃঢ়মুষ্টিতে আমার বাঁ হাতটা ধরিয়া আছে। এইটুকু বুঝিতেছি যে; যতবার উঠিবার চেষ্টা করিতেছি, ততই ঢেউয়ের

উপর ঢেউ আসিয়া অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে এবং এই ভাসা-ডোবার ক্ষণিক আলো ও ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে কতকগুলা ত্রস্ত মিশ্র কলরোল ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে।

ইহার পরের ব্যাপার যাহা আমার মনে পড়ে, তাহা এই যে, আমি বাবুঘাটের একটি রানার উপর চিত হইয়া শুইয়া আছি। আমাকে ঘিরিয়া একটি বেশ বড়গোছের ভিড়। কাছে সিক্তবসনে, পা মুড়িয়া পণ্ডিতমশাই বসিয়া আছেন।

প্রথম সংলগ্ন কথা কানে গেল—"ঐ চোখ খুলেছেন !···কেমন আছেন মশাই ?···আর একটু ব্র্যাণ্ডি হ'লে হ'ত।···কোথায় গেলে হে, দেখ না আর একটু পার কি না যোগাড় করতে···"

একজন সরিয়াআসিয়া মুখের কাছে ঝুঁকিয়া একটু জোরেই বলিল, "ঠিকানাটা দিন, না হয় খবর দিই ; অবিশ্যি ভয় নেই, মা-গঙ্গাকে ডাকতে থাকুন।"

আশা করিয়াছে, প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছি। কোন রকমে ঠিকানাটা দিয়া ক্লান্তির বশে আবার চক্ষু বুজিলাম। শুনিতেছি, "পেলে ? ওঁকেও দাও একটু ব্র্যাণ্ডি।···খেয়ে নেবেন ঠাকুরমশাই ঢুক করে একটু ? ওষুধ, ওতে দোষ নেই।"

একটা ক্লান্ত স্বরে উত্তর হইতেছে, "না না বাবারা, আমি হবিষ্যাশী ব্রাহ্মণ, আমায় শুনতে নেই ও কথা। দাও নি তো আমায় খাইয়ে-টাইয়ে ? দুর্গা ! তা হ'লে আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। একটু জিরিয়ে আমি বেশ যেতে পারব'খন, একটা গাড়ি ডেকে দিও বরং।"

ভাঙা ভাঙা হিন্দী-বাংলায় কে বলিতেছে, "না মহারাজজী, আপনার মুহমে কিছু না দিয়েছে, আপনি তো বরাবর জাগিয়ে ছিলেন। শুধু একবার দু মিনিটকা বাস্তে বেহোস হয়ে গেলেন। যেই বাবু ওপর থেকে গঙ্গাজীমে গিরিয়ে পড়ল কি···"

স্মৃতিটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। স্বরটা যেন চেনা, খুব সম্ভবত মাঝির; পণ্ডিতমশায়ের শক্তির পরিচয় পাইয়াছে, সংযমের পরিচয় পাইয়া ওর মনটা শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছে। আসল ঘটনাটা সবাইকে বুঝাইতে চায়, কিন্তু বৃদ্ধ যুবাকে বাঁচাইবে, এ কথাটা কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে না। ওরই নৌকায় দুর্ঘটনা হইয়াছে, সুতরাং ওর সত্য-মিথ্যা কোন কথাই গ্রাহ্য হইতেছে না। আমি যে পণ্ডিতমশায়ের টিকি যথা-পদ্ধতিতে বাগাইয়া ধরিয়াছিলাম আর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, এইগুলা আমার পক্ষে মস্ত বড় প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

কি একটা বলিবার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করিতেছি, কিন্তু শক্তি হারাইয়া যেন কোথায় তলাইয়া চলিয়াছি। গলায় একটা উগ্র জ্বালা অনুভব করিলাম, আবার যেন অতল হইতে ভাসিয়া উঠিতেছি; যা হোক্ চলিয়া যাইতে পারিব। কেমন একটা অস্পষ্ট আনন্দে আমায় উপরে ঠেলিয়া তুলিতেছে, কোথাও বহুদিনের জন্য যাইবার আগে সবচেয়ে দরকারি কথাটা বলিয়া যাইবার একটা অস্পষ্ট নিশ্চিন্ততা, একটা দায়-মুক্তির ভাব, হাতটা বাড়াইলাম, গোলমালটা হঠাৎ বাড়িয়া কোথায় যেন বিলীন হইয়া গেল।

দ্বিতীয় বার যখন সংজ্ঞা হইল, তখন পূর্বের চেয়ে বল পাইয়াছি মনে হইল। ঘটনাটাও পূর্বাপর যেন স্পষ্টতরভাবে মনে পড়িতেছে। কনুইয়ের উপর ভর দিয়া একটু সোজা হইয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছি, চারিদিকে আতঙ্কসূচক একটা বারণের কলরব উঠিল, "আপনি একটু শুয়ে থাকুন মশাই, অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, ততক্ষণ..."

বলিলাম, "অ্যাম্বুলেন্সে দরকার নেই। পণ্ডিতমশাই কোথায়?"

একসঙ্গে উত্তর ও অভিমত আরম্ভ হইয়া গেল, "তিনি চলে গেছেন গাড়ি করে·· তাঁর তো বিশেষ কিছু হয় নি, আপনি সমস্ত ভারটা

নিজের ওপর তুলে নিয়েছিলেন কিনা···কি রকম বোধ করছেন এখন ?"

আপত্তি সত্ত্বেও উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম, "ভালই বোধ হচ্ছে ; আপনারা সরে গিয়ে একটু হাওয়া ছাড়ুন দয়া করে।"

অগ্রণী কয়েকজনের ঠেলাঠেলি আর অনুরোধে ভিড়টা একটু পিছনে সরিয়া গিয়া জায়গা ছাড়িয়া দিল। মিনিটখানেকের জন্যও নয়, তখনই আবার বীরের মুখের কথা শুনিবার আগ্রহে আরও চাপ বাঁধিয়া ঘিরিয়া ফেলিল ; নানাবিধ প্রশ্ন, মন্তব্য—"কি হয়েছিল মশাই ? ···আচ্ছা দোরস্ত হাত, এসা বজ্রমুষ্টিতে পণ্ডিতমশায়ের টিকিটা ধরেছিলেন মুঠিয়ে। আপনি যখন ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, তখন উনি বুঝি একেবারে তলিয়ে গেছেন ?"

মাঝিটা কি বলিতে যাইতেছিল, চারিদিক হইতে আবার মারমুখো হইয়া উঠিল সকলে—"তোম্ চোপ্ রও, পুলিসমে হ্যাণ্ডোভার করেগা। বল্, কি তোর নৌকোর নম্বর···ব্যাটার লাইসেন্স কনফিস্কেট করিয়ে দাও ···যত সব আনাড়ী মুল্লুক থেকে এসে জুটেছে, হাল ধরতে পারে না, রোজ একটা না একটা···"

বলিলাম, "ওকে বলতে দিন মশাই, কি হয়েছিল আসলে ওই জানে, আমার ঠিক গুছিয়ে মনে আসছে না।"

একটি বয়স্থগোছের লোক আগাইয়া আসিলেন, বলিলেন, "গুছিয়ে মনে পড়া মানে? তুমি তো আর যাত্রার মহলা দিচ্ছিলে না বাপু যে, পড়া মুখস্থর মত সব মনে করে করে বলবে! দেখলে, একটা বুড়ো মানুষ যেতে বসেছে, যেমন ছিলে তেমনটি ঝাঁপিয়ে পড়েছ।···সাবাস ছোকরা! বাঃ! তোমার চেহারা দেখলে মনে হয়, জলে পড়লে কুটোর মতো ভেসে যাবে, কিন্তু তুললে তো লাস ডাঙায় টেনে! কোথায় বাড়ি।"

বলিলাম, "মশাই, আমি তাঁকে টেনে তুলেছি বললে ভুল হয়। আমি তো…"

বৃদ্ধ বাধা দিয়া অনুমোদনের ভঙ্গিতে তর্জনীটি বাঁকাইয়া বলিলেন, "নিমিত্ত মাত্র। ঠিক ঠিক। সাধু সব কর্ম তাঁকেই সমর্পণ করবে বাবা; আমি করলাম, আমি ধরলাম, আমি এত বড়, আমি তত বড়, আরে তুই কে? কতটুকুই বা খ্যামতা তোর?"

একটা বখাটে গোছের ছোকরা একটা বিড়ির শেষ প্রান্তে টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "তুই তো স্রোতের কুটোটি? কি বলুন ঠাকুরমশাই?"

বৃদ্ধ তাহার দিকে একবার আড়ে চাহিয়া লইয়া ইহাদের বলিলেন, "নাও একটা গাড়িটাড়ি ডেকে দাও তোমরা কেউ, ভিড় হ'লেই আবার গাঁটকাটা জোটে।…তুমি ঘরে যাও বাবা, ভিজে কাপড়ে আবার বেশিক্ষণ থাকাটা—"

ছোকরার দিকে আর একটা বক্রদৃষ্টি হানিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

ঘোড়ার গাড়িটা মেট্‌কাফ হলের প্রায় কাছাকাছি আসিয়াছে, "এই গাড়োয়ান! এই গাড়োয়ান!"—করিয়া একটা চীৎকার কানে গেল এবং গাড়োয়ানটা গাড়ি থামাইয়া ফেলিল। গলা বাড়াইয়া দেখি, সেই বখাটে গোছের ছোঁড়াটা আর একজন ভদ্রবেশী যুবক, একরকম ছুটিয়াই চলিয়া আসিতেছে। নিকটে আসিয়া ছোকরা আমায় দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই ইনি।" আমি বিস্মিতভাবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

যুবক যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "নমস্কার! ডিটেন্‌ করলাম, মাফ করবেন। আপনিই আজ একজন জলমগ্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করেছেন?"

বলিলাম, "আজ্ঞে, আমি তাঁকে, উদ্ধার করি নি, আসলে…"

"ভগবান করেছেন।"—বলিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত যুবক পকেট হইতে একটা নোটবুক-গোছের বাহির করিয়া একটা কি টুকিয়া লইল, তাহার পর নোটবুক আর পেন্সিলটা হাতে করিয়াই বলিল, "সে তো ঠিক, আমরা কে? …ইফ ইউ ডোণ্ট্ মাইণ্ড্, আপনার সঙ্গে খানিকটা যেতে পারি কি? মানে, ওখানে আমি খানিকটা বিবরণ যোগাড় করেছি, তারপর এ বললে আপনি বোধ হয় বেশি দূর যান নি, তাই ভাবলাম…মানে, আমি হচ্ছি 'দৈনিক সত্যপ্রকাশে'র স্টাফ রিপোর্টার…"

বলিলাম, "মশাই, যদি আদত কথাটা রিপোর্টেড হয়, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু…"

যুবক গাড়ির দরজার হ্যাণ্ডেলটা ঘুরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "একটি অক্ষর বাদ যাবে না। এইখানেই বসে বসে স্টোরি ঠিক করে নিয়ে আপনাকে শুনিয়ে নোব। ডাক-এডিশনেই বের করে দোব আপনাকে।…এই কোচম্যান্, হাঁকো।…বাই দি বাই, ফোটো আছে আপনার?"

বলিলাম, "আছে একটা বোধ হয়।"

"তবে আর কি! সুইমিং-কস্ট্যুমে?"

"না, ধুতি-চাদরে।"

যুবক একটু বোধ হয় নিরাশ হইল, কিন্তু তখনই উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হয়েছে, আই হ্যাভ্ এ ব্রেন্-ওয়েভ্। আপত্তি না থাকে তো নেমে সরকার কোম্পানির ওখানে আপনার একটা টাটকা-টাটকি ফোটো তুলিয়ে নিই। চমৎকার হবে। এই ভিজে কাপড়-জামা, ভিজে চুল, ক্লান্ত ভাব…"

দৈনিক কাগজের রিপোর্টার স্বয়ং সশরীরে আমার সামনে! কি রকম একটা যশের মোহ ধীরে ধীরে পাইয়া বসিতেছে! তবুও ক্লান্তিতে

দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, বলিলাম, "সিধে বাড়িই যেতে দিন এখন মশাই ; সমস্ত জলটা গায়েই শুকোচ্ছে…"

"এই স্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপর, একটু ভেতরে গিয়েই। বিলেত হ'লে আপনি বোধ হয় এতক্ষণ পঞ্চাশখানা কাগজে উঠে গেছেন—অল্‌রেডি। আমাদের অর্গ্যানাইজেশ্বন্ তার সিকির সিকিও নয়। তবু—মিনিট পাঁচেকও লাগবে না। আপনার একটু পাব্লিসিটি দরকার মশাই, অমন সব ব্যাপারই তিনিই করিয়েছেন বলে ছেড়ে দিলে চলে না। কাল আপনার এই রকম ভিজে কাপড়, ভিজে চুলের ব্লকের সঙ্গে অ্যাকাউণ্ট বেরুবে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ থেকে অসাধারণের কোঠায় উঠে পড়বেন।…হ্যাঁ, বলতে হবে না, বুঝেছি, আপনার ফিলিংস ; কিন্তু দেশের সামনে আদর্শ থাকা চাই তো মশাই, সবাই ভালো কাজ করে যদি 'ত্বয়া হৃষীকেশ' বলে চুপ করে ঘরে লুকিয়ে থাকেন তো দেশের ইউথ্‌রা আদর্শ পায় কোথা থেকে ? আর ওসব পুরানো ইয়ে ছাড়ুন মশাই, সাঁতরে আধমরা হলেন আপনি, ক্রেডিট্‌টা নেবেন হৃষীকেশ ?… উত্তর দিন, চুপ করে থাকলে শুনব কেন ? নিন, সিগারেট খান।…ও খান না ? এক্‌স্‌কিউজ্ মি…"

সিগারেট খাই, বিশেষ দরকারও ছিল। খাই যে তাহার প্রমাণ পকেটে ভিজে গোল্ডফ্লেকের বাক্সের মধ্যে আছে। কিন্তু ভদ্রলোক নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। ঠিক মুখবন্ধও বলিতে পারি না, স্পষ্ট উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে না, ওটা অভ্যেস নেই।"

যুবক পেন্সিলটা নোটবুকের উপর লাগাইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "মানে, আপনার মত হচ্ছে, ওটা মস্তবড় একটা বদ্ অভ্যেস ? আপনার বক্তব্য—স্মোকিং লাংস্‌কে উইক্ করে দম নষ্ট করে দেয় ?"

অথচ প্রশ্নকর্তা স্বয়ং ধূমপান করিতেছে। আমি কতকটা কুণ্ঠিতভাবে,

পকেটের বাক্সটার উপর হাতটা ধীরে ধীরে চাপিয়া বলিলাম, "একটু করে বইকি অপকার।"

"একটু না, বিলক্ষণ। আমাদের কথা বাদ দিন, ভবঘুরের দল।" পেন্সিলটা চালাইতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া আমার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "নাম?"

বলিলাম, "শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।"

যুবক পড়িতে পড়িতে লিখিয়া চলিল, 'শৈলেনবাবু মনে করেন ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিকারক, যেহেতু নিকোটিন নামক বিষাক্ত পদার্থ ফুসফুসযন্ত্রকে দুর্বল করিয়া শেষ পর্যন্ত রুগ্ন করিয়া তোলে এবং তাহার দ্বারা পরিশেষে প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করিয়া যাঁহারা ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলাধূলা এবং সন্তরণ বা অন্য কোন প্রকার ব্যায়াম করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ধূমপানের শৈলেনবাবু একেবারেই বিরোধী। তিনি নিজে সমস্ত জীবনে কোন মাদক দ্রব্যই স্পর্শ করেন নাই এবং এবিষয়ে কাহারও মতের সঙ্গে আপোস করিতে একেবারেই নারাজ।'

বিনা আয়াসেই বাঁধা গতের মতো সমস্তটা লিখিয়া যুবক পেন্সিল থামাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন, এই আপনার অভিমত তো? অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখুন মশাই।"

বেশ অনুভব করিতেছি, মোহটা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে আমায়। কাল এই সময় সমস্ত বাংলা দেশে শৈলেন-বাবুর মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার কোন্ একটা গলির অখ্যাত অজ্ঞাত শৈলেন নয়, বিখ্যাত সন্তরণবীর, উদারপ্রাণ পরোপকারী শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তবুও কিন্তু পণ্ডিতমশাইয়ের শান্ত নিরহংকার মূর্তিটি মনে পড়িয়া যাইতেছে, বোধ হয় মুখ ফুটিয়া বলেনও নাই যে, তিনিই আমার ত্রাণকর্তা।...চিন্তার একটা যেন

অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তো এই রকমই ভাবি।"

যুবক "সো ফার সো গুড্" বলিয়া একটু গুছাইয়া বসিল। সিগারেটটা ধরাইয়া তুইটা আঙুলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "এবার আমি এ পর্যন্ত যতটা সংগ্রহ করতে পেরেছি লিখে ফেলি। সংগ্রহ করা কি সহজ মশাই? জিজ্ঞেস করে করে একটা দাঁড় করানো। তা আপনাকে যখন পাওয়া গেছে শেষ পর্যন্ত, তখন শুনিয়ে মিলিয়ে নিলেই হবে। একটু রেস্ট্ নিন, মেলা বকাবো না আপনাকে।"

মাঝে মাঝে গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে, কখনও বা পেন্সিলটা ঠোঁটে চাপিয়া একটু ভাবিয়া লইয়া গড়গড় করিয়া খানিকটা লিখিয়া ফেলিল। আমার মনটা অকৃতজ্ঞতার অনুশোচনা আর যশের আকর্ষণে তোলপাড় খাইতেছে। একবার সিগারেটটা সরাইয়া সমস্তটা মনে মনে পড়িয়া ও এক-আধটা জায়গা সংশোধন করিয়া লইয়া যুবক বলিল, "শুনুন, যেখানটা ঠিক হবে না, বলবেন।—

'গঙ্গাবক্ষে নৌকা-তুর্ঘটনা

নদীগর্ভ হইতে নিমজ্জিত অশীতিপর বৃদ্ধের পুনরুদ্ধার

বাঙালী সন্তরণবীরের অসমসাহসিকতা

'কল্য গঙ্গাবক্ষে একটি শোচনীয় তুর্ঘটনা একজন বাঙালী যুবকের সৎসাহস ও আত্মত্যাগের প্রেরণায় নিবারিত হইয়াছে। চাঁদপাল ঘাটের সাতটা-বারোর স্টীমার ছাড়িয়া যাইবার পর অবশিষ্ট কয়েকজন যাত্রী লইয়া শিবপুর ফেরী ঘাট হইতে একটি নৌকা ছাড়ে। যাত্রীদের মধ্যে একজন প্রায় অশীতিপর পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন, আর ছিলেন'··· আপনার ঠিকানাটা?"

ঠিকানাটা দিলাম। যুবক খালি জায়গাটুকুতে ঠিকানাটা বসাইয়া দিয়া পড়িতে লাগিল, "আর ছিলেন হাতিবাগানের (১৭ নং রামু খানসামা

লেন) বিখ্যাত সাঁতারু শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২৬)। পুরোহিত মহাশয় শুচিবায়ুগ্রস্ত, নৌকায় দুই-একজন ধোপা ও নিম্নশ্রেণীর লোক থাকায় তিনি সকলের নিষেধ সত্ত্বেও এক প্রান্তে গিয়া উপবেশন করেন। নৌকা প্রায় মাঝগঙ্গায়—ভিন্নমুখী দুইটি স্টীমারের ঢেউ লাগিয়া নৌকা হঠাৎ বানচাল হইয়া যায়। পশ্চিমা আনাড়ী মাঝি কোন প্রকারেই সামাল দিতে না পারায়…"

যুবক নোটবুক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া বলিল, "দুটো লাইন দিলাম মশাই জুড়ে, যত সব আনাড়ী পশ্চিমা এসে নিতুই এই রকম দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। তাও চোখের সামনে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, খোঁজ রাখবে? বলে, সেই বুড়ো আপনাকে তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়ল! ইডিয়ট! As if one could swallow that absurdity! ঐ যে পুরুত, আর রক্ষে আছে? কত কায়দা করে, আর পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে তবে আসল ব্যাপারটা বের করা গেল।…হ্যাঁ, 'সামাল দিতে না পারায়, বৃদ্ধ টাল সামলাইতে না পারিয়া সেই বিপরীত মুখী জাহাজের ঢেউয়ের মধ্যে পড়িয়া গিয়া একেবারেই তলাইয়া যান। জাহাজে ইতরভদ্র অনেকগুলি লোক ছিল, কিন্তু কেহই এই বৃদ্ধের প্রাণরক্ষার্থে অগ্রসর হইল না। শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র নৌকার ছইয়ের উপর পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিলেন; বোধ হয় স্বভাবত একটু ভাবপ্রবণ হাওয়ায় কিছু অন্যমনস্ক ছিলেন, প্রথমটা সেকেণ্ড কয়েক কিছু বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ঘুরিয়া প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ংগম করামাত্র যেমনভাবে ছিলেন ঠিক সেই অবস্থাতেই উর্মিমধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া যাওয়ায় ঘটনাটি কোন স্টীমার বা অপর কোন নৌকার গোচরীভূত হয় না এবং বৃদ্ধকে উদ্ধার করা নিরতিশয় দুষ্কর হইয়া পড়ে। তাহার উপর তীব্র জোয়ারের টানে বৃদ্ধ পতনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়' —কি বলেন, প্রায় রশিখানেক দূরে গিয়ে পড়েছিলেন বলে আপনার মনে হয়?"

চমৎকার দাঁড় করাইয়াছে! এত বড় একটা বীরত্বের মূল নায়ক হওয়ার লোভ না হইয়া পারে না। মনে করার ভঙ্গিতে একটু টানিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, তা রশিখানেক হবে বইকি—ইজিলি।"

অনুশোচনার দংশনে আর ততটা জ্বালা নাই; অথবা কোথায় একটা সগর্ব আনন্দ ঠেলিয়া উঠিতেছে, তাহাতেই বিষটা কতকটা নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতেছে, যাহাই হউক।

"তীব্র জোয়ারের টানে বৃদ্ধ পতনের সঙ্গে সঙ্গেই রশিখানেকেরও আগে গিয়া পড়েন। নৌকার আর সকলেই নৌকার আশেপাশে অন্বেষণ করিতেছিল, কিন্তু'···এবার আপনি নিজের মুখেই বলুন শৈলেনবাবু, মানে, ঝাঁপ দিয়েই আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অর্থাৎ প্রেজেন্স্ অব মাইণ্ড্ হারিয়ে ফেললেন; না, বেশ বুঝতে পারলেন, বৃদ্ধ নিশ্চয়ই হাতের কাছে নেই, তলিয়ে রশিখানেক দূরে ঠেলে উঠে থাকবেন?"

একটা যে কুণ্ঠা ছিল, বেশ অনুভব করিতেছি সেটা দ্রুত অপসৃত হইয়া যাইতেছে। ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "না, ও সামান্য ব্যাপারে আর মাথা ঠিক রাখতে পারব না?"

যুবক যোগাইয়া দিল, "ডুবন্তদের উদ্ধার—এ তো রোজই আপনাদের স্থইমিং ক্লাবে প্র্যাক্‌টিস্ করছেন, কি বলেন?···হ্যাঁ, বাই দি বাই, কি নাম আপনাদের ক্লাবের?"

পাড়ায় কয়টা সাঁতারের ক্লাব আছে, অথবা একটাও আছে কি না, জানা নাই। বলিলাম, "আমাদের আহিরীটোলা স্থইমিং ক্লাব।"

"আমারও ঐ রকম একটা আন্দাজ ছিল। এ তো শখের ওয়াটার-পোলো-খেলা হাত নয়, দস্তুরমত স্রোতে প্র্যাক্‌টিসের লক্ষণ। আমার মনে হয়, এর আগে আরও দু-পাঁচটা অ্যাক্‌সিডেণ্টে হাত পাকিয়েছেন আপনি। 'না' বললে শুনব কেন মশাই?"

একেবারে সোজা 'হ্যাঁ' বলাটা বিপজ্জনক, তবে 'না'-ও বলিতে মন সরিল না। মুখটা নিচু করিয়া লজ্জিতভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলাম।

স্টুডিওর ফ্ল্যাশ-লাইটে ফোটো লওয়া হইল। লিখিতে লজ্জা হয়, ফোটো লইবার পূর্বে টাটকা নদী ছাড়িয়া ওঠার ভাবটা বজায় রাখিবার জন্য মাথায় এক ঘটি জল ঢালিয়া লইতেও রাজি হইলাম। যুবকেরই 'প্রযোজনায়' মুখে দিব্য একটি ক্লান্ত অথচ উদার আত্মত্যাগের ভাবও ফুটাইয়া রাখিতে সমর্থ হইলাম।

পরদিন সকালে ক্লান্তির জন্য একটু বিলম্ব করিয়া উঠিলাম; কিন্তু উঠিয়াই দেখি, এত বিখ্যাত হইয়া গিয়াছি যে নিজেকেই নিজে চেনা দায়।

প্রথমেই পিসীমার সঙ্গে দেখা। অত্যন্ত রাগিয়া আছেন বলিয়া বোধ হইল। কারণ না জানায় প্রশ্ন করিতেই ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, "সকালবেলায় মুখ খুলব না মনে করেছি শৈল, আমায় বকাস নি? তোর এরকম বিদকুটে বাই কেন শুনি? একটা এঁদো ডোবার কখনও মুখ দেখলেন না, উনি বীরপুরুষ হয়ে গঙ্গায় সাঁতরে···"

বুঝিলাম, কালকের জের, খবরটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, "একটা লোক ডুবে মরছে চোখের সামনে, চেষ্টা করব না পিসীমা? কি যে বল তুমি! কিন্তু তুমি টের পেলে কি করে?"

"না, টের পেয়ে কাজ কি! সমস্ত শহরে ঢি ঢি পড়ে গেছে, কাগজে কাগজে ছবি, আর বাইরে একপাল সব জড়ো হয়ে বসে আছে। অলপ্পেয়েদের আর কি! হাততালি দিয়ে দিয়ে উস্কে দিয়ে একটা কাণ্ড না ঘটিয়ে ছাড়বে? দাদা আসুন, বলি, আমায় দিন কাশী পাঠিয়ে,

নইলে বুড়ো বয়সে আমায় অনেক কিছু দেখতে হবে। শরীরে দম নেই, অথচ গোঁয়ার্তুমি ষোল আনা,—ও ছেলেকে মাদুলি-মানতে কতদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে? জলে-ভেজা ছবি দেখলে বুক আঁতকে ওঠে একেবারে!"

গরগরানি শুনিতে শুনিতে বাহিরে আসিয়া দেখি, সত্যই প্রায় জন ত্রিশেক ছোকরা বাহিরের ঘরে, বারান্দায় ভিড় করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সবার মুখেই একটি স্তম্ভিত শ্রদ্ধার ছাপ। বাহির হইতেই সকলে কপালে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল। কয়েকজনকে চিনি, তাহাদেরই একজনকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "যতীন, ব্যাপার কি হে?"

যতীনের হাতে একখানি 'সত্যপ্রকাশ', অগ্রসর হইয়া বিনীত হাস্যের সহিত আমার হাতে কাগজটা দিয়া বলিল, "ব্যাপার আপনার পক্ষে কিছুই নয়, আমাদের পাড়ার আজ মুখোজ্জ্বল হয়েছে।"

কাগজটার দিকে চোখ পড়তেই সমস্ত শরীরে একটা রোমাঞ্চ হইয়া গেল,—সিক্ত বস্ত্র, সিক্ত কেশে আমারই ছবি, এমন একটা চমৎকার ক্লান্ত অথচ নির্লিপ্ত ভাব, যেন এই জগতের বহু উর্ধ্বে কোন এক ভিন্ন জগতের মানুষ আমি। একবার মনেও পড়িতে দিল না যে, আমি একজন অভিনেতা,—অত ভালোও কিছু নয়, একজন প্রবঞ্চক মাত্র। বিবরণীর খানিকটা পাঠ করিলাম, তাহার পর কাগজটা ফিরাইয়া দিতে দিতে বলিলাম, "যা অপছন্দ করি তাই, টেরই বা পেলে কি করে? ফোটোই বা নিলে কখন?"

যতীন ধীরে ধীরে হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "জানি আপনি পাব্লিসিটি পছন্দ করেন না, নইলে এতদিন এই পাড়ায় রয়েছেন, ঘুণাক্ষরেও কি কেউ জানতে পেরেছে যে···আমরা কিন্তু আজ সন্ধ্যেয় আপনাকে একটা অভিনন্দন দোব ঠিক করেছি···না, মত না দিলে শুনব না।"

একটি নতুন জগৎ একেবারে! যশ—অপ্রত্যাশিত যশ ;—একটা নবজীবন। একটা চাপা উল্লাসের জোয়ার সত্য-মিথ্যার বিচারকে তৃণখণ্ডের মতই কোথায় যেন ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তবু চকিতে একটি আত্মসমাহিত নির্লোভ ব্রহ্মণ্যমূর্তি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল —আমার এ যশোলোকেরও বহু ঊর্ধ্বে কোন্ এক লোকে। কি একটা বেদনা—ক্ষণিক, কিন্তু তীব্র ; যশোঘাতীর অনুতাপ।

বলিলাম, "না, আমি ওসব একেবারেই পছন্দ করি না।"

সমস্বরে আপত্তি হইল, "সে তো জানিই—তবে, আমাদের একটা কর্তব্য আছে তো। আজ সন্ধ্যেয় আমাদের ক্লাবে···আপনার এই ছবিটা এন্‌লার্জ করিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে এসেছি আর্টিস্ট্‌কে।"

যাক, বিবেকের কাছে কর্তব্য তো করা হইল। যদি না-ই ছাড়ে এরা তো কি করিতে পারি আমি?

কি রকম যে একটা স্বস্তি অনুভব করিতেছি!

ঠেলিয়া সামনে আসিল অপর দলের কয়েকজন। চিনি না। একজন অগ্রসর হইয়া বলিল, "কাগজে দেখলাম, আপনি আহিরীটোলা ক্লাবের মেম্বার···"

বেশ অনুভব করিলাম, আমার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত যেন উঠিয়া গেল এক মুহূর্তে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিল। এইবার চোরের যা প্রাপ্য, প্রবঞ্চকের যা পুরস্কার।—কিন্তু অদৃষ্ট স্বয়ং যখন একের প্রাপ্য মাল্য অন্যের কণ্ঠলগ্ন করে, তখন আটঘাট বাঁধিয়াই করে ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপর একজন বলিল, "কিন্তু আহিরীটোলায় তো মাত্র একটা সুইমিং ক্লাব নয়, এমন অনেক আছে ; তবে আমাদের ক্লাবটাই সবচেয়ে প্রাচীন আর রেস্‌পেক্টব্‌ল্। সাতটা রেকর্ড ব্রেক করা আছে আমাদের—আড়াইশো মেম্বার। কিন্তু আমাদের ক্লাবে আপনার নাম না দেখে···"

কপালের ঘামটা মুছিয়া বলিলাম, "ক্লাবের নামটা আমি ডিস্‌ক্লোজ্‌ করতে চাই না, মাফ করবেন।"

যতীন সহায় হইল, বলিল, "উনি চান না পাব্লিসিটি, তবে আর শুনছেন কি?…কিন্তু আপনার যা-তা একটা ক্লাবেও পড়ে থাকা চলে না শৈলেনদা।"

ওদিক হইতে আবার নিবেদন, "আমাদের ক্লেম্‌টা আগে… আপনি বরং চলুন একবার আমাদের ক্লাবে একটু সময় করে, দেখবেন…"

সাতটা রেকর্ড ভাঙিবার স্পর্ধা রাখে, এমন ক্লাবের দিকে পা বাড়াইব অতটা দুর্বুদ্ধি নিশ্চয় কখনও হইবে না। তাহা হইলে তাহারা এই দুর্বল পা জোড়াটাই কি ছাড়িয়া দিবে? তবু বলিলাম, "আচ্ছা, আপনাদের রুলস্‌-রেগুলেশন্স্‌গুলো দেখাবেন একবার, তবে তারাও কি ছাড়তে চাইবে শীগ্‌গির?"

কিছু লোক পাতলা হইল, কিন্তু বাড়িল আরও বেশি। পাড়াতেই দুইটা সুইমিং ক্লাব আছে, তিনটে হিতকারিণী সভা আছে। একটু দূরে দূরে আড্ডা, খবর পাইতে একটু দেরি হইয়াছে বোধ হয়। আসিয়া উপস্থিত হইল। আরও একটু বেলা হইতে আসিল পাঁচজন রিপোর্টার—তিনটি ইংরেজী ও দুইটি বাংলা কাগজের। একেবারে আপ-টু-ডেট, মায় কাঁধে স্ট্র্যাপ দিয়া ক্যামেরা পর্যন্ত ঝোলানো।

যশের সৌধ আকাশ লক্ষ্য করিয়া উঠিতেছে—দ্রুত, অব্যর্থ। কিন্তু তাসের সৌধ, একজনের দুটি কথাতেই কি ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে না? উল্লাসের পাশে কোথায় একটা আতঙ্ক জমিয়া উঠিতেছে। যেখানে একটা ক্ষীয়মান শ্রদ্ধা ছিল, সেখানে কি একটা বিদ্বেষের ভাবও ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে? না, কোথাও এখনও একটু অনুতাপ রহিয়াছে জাগিয়া?

এমন সময় গলি ঘুরিয়া সাইকেলে অতি ক্ষিপ্রগতিতে মণিমোহন আসিয়া উপস্থিত হইল। মণি আমার কলেজের অন্তরঙ্গ বন্ধু, থাকে বৈঠকখানা রোডে।

মণিমোহনের দৃষ্টিটা উদ্‌ভ্রান্ত। খুব জোরে ঘণ্টি দিতে দিতে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া বারান্দায় উঠিয়া পড়িল। ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হইতেই উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল, "কি রকম আছিস? কি করে পড়লি পিছলে? তোর আবার আম্বাটুকু আছে কি না, কবিত্ব করে সূর্যাস্ত দেখছিলেন বাবু!"

শান্তভাবে বলিলাম, "বো'স, কোথায় শুনলি?"

"স্বয়ং পুরুতমশায়ের কাছে, যিনি বাঁচালেন তোমায়। প্রথমটা অত বুঝতে পারি নি, তারপর যখন তোর নাম শুনলাম, ইস্তক ঠিকানা শুদ্ধ..."

আমার অবস্থা বর্ণানাতীত। শুধু এইটুকু হুঁশ আছে যে, যে-মিথ্যাকে কুণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্রয় দিয়াছি, এবার তাহাকে বুকে হাতে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে, না হইলে গঙ্গাগর্ভের চেয়েও অতলে ডুবিলাম। সমস্ত দলটা যেন মন্ত্রবলে নির্বাক হইয়া গিয়াছে। আমি প্রসন্ন অবহেলার হাসি হাসিয়া বলিলাম, "তিনি বললেন তিনিই আমায় বাঁচিয়েছেন? ভালো! কি বললেন একটু শুনিই না, বেশ ইন্‌টারেস্টিং হবে।"

সেই ভাবেই চাহিয়া একবার সবার মুখের উপর দিয়া দৃষ্টিটা ঘুরাইয়া আনিলাম। মণিমোহন অতিমাত্র বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "মানে?"

আমি ধীরে ধীরে কাগজটা বাড়াইয়া দিলাম এবং সকলেই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মণিমোহনের পরিবর্তিত মুখভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। উপরে কাগজের নামটা স্পষ্টাক্ষরেই লেখা, মণিমোহন তবুও শেষ করিয়া একবার প্রথম পৃষ্ঠাটা উল্‌টাইয়া দেখিয়া লইল, ব্লক টাইপে 'সত্যপ্রকাশ'

লেখাটা জলজল করিতেছে। মণি ধীরে ধীরে আমার মুখের উপর চোখ তুলিয়া বলিল, "আর স্বচ্ছন্দে আমায় উল্টো বুঝিয়ে দিলে বুড়ো! হয়েছিল সন্দেহ ভাই। তুই ষাট বছরের একটা নড়বড়ে বুড়ো; চাল-কলা খেয়ে জীবন কাটালি, হোক্ রোগা, কিন্তু তবুও একটা সমর্থ লোক তো? পারিস তাকে তুই তুলতে? লোকটা যে এরকম, কখন স্বপ্নেও ভাবি নি রে!"

দলের মধ্যে কে একজন বলিল, "কত রকম লোক আর কাণ্ড দুনিয়ায় দেখবেন মশাই। উই লিভ্‌টু লার্ন্।"

একজন রিপোর্টার আগাইয়া আসিয়া কহিল, "আমাদের অভিজ্ঞতায় এরকম ঘটে মাঝে মাঝে। যশের লোভ!···কি করেন ভদ্রলোক?"

মণিমোহন চোখ বড় বড় করিয়া উত্তর করিল, "আমাদের কুলগুরু মশাই! থাকেন শিবপুরে। কাল রাত্তিরে···"

সমস্ত ভিড়ের মধ্য হইতে একটা গুঞ্জন উঠিল, "গুরুঠাকুর!···ফোঁটা-চন্দন!···নো ওয়াণ্ডার!"

বুকের কোথায় একটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল। মুখের ব্যঙ্গহাস্যটা কিন্তু বেশ সহজভাবেই ধরিয়া রাখিলাম।

সার্টিফিকেট

আজ নিয়োগ-পত্র পাইয়াছি।

এমন কিছু বড় চাকরি নয়, গৃহশিক্ষকতা মাত্র, তবে লোভনীয়। জমিদার বাড়ির গৃহশিক্ষকতা ; জায়গাটি মফঃস্বল হইলেও খুব স্বাস্থ্যকর ; বেতন আশী টাকা ; খাওয়া, পরা, থাকার ব্যবস্থা ওঁদেরই ; ছেলেটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, অর্থাৎ তিন বৎসর পরে ম্যাট্রিক দিবে। ছেলে পাশ করিলে তাহার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে হইবে ; কলেজ জীবন শেষ হইলে জমিদারিতেই চাকরির সম্ভাবনা আছে।

নিয়োগের একটা বড় সর্ত ছিল সার্টিফিকেট। অভিজ্ঞতা, চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে খুব উঁচু ধরণের সার্টিফিকেট না থাকিলে দরখাস্ত করিবার ব্যর্থতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল।

কোনই আশা ছিল না। এমন জায়গায় প্রথম শ্রেণীর এম্-এ, পি-এইচ-ডি-দের দরখাস্ত পড়িবে, তাহার উপর মুখ দেখাদেখি আছে, সুপারিশ আছে ; আমার মতো নিঃসহায় মামুলী বি-এ কোথায় ভাসিয়া যাইবে। তবু লোভের বশে দরখাস্তটা করিয়া দিয়াছিলাম। লোভ জিনিসটাকে রিপুর পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে, এ-ক্ষেত্রে কিন্তু আমার বন্ধুরই কাজ করিল।

আবার এও ভাবি,—বেশি বন্ধুর কাজ কে করিল,—লোভ, না আমার ছাত্র শ্রীমান্ নিকুঞ্জলালের প্রবন্ধ ?

নিকুঞ্জলালকেও আমি অষ্টম শ্রেণী হইতেই পড়াইতে আরম্ভ করি, এইবার ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করিল, এই সবে এক সপ্তাহ হইল পরীক্ষার

ফল বাহির হইয়াছে। মন্দ হইল না, সেকেণ্ড ডিভিশন। নিকুঞ্জলালকে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করাইয়া আমিও যদি আজ নেপোলিয়নের মত বলি, 'অসম্ভব' কথাটা মূর্খদের অভিধানেই পাওয়া যায় তো নিতান্ত অশোভন হয় না।

নিকুঞ্জলালের পিতা ব্রজমাধব খুবই প্রীত হইয়াছেন; বলিলেন, "আপনি এক অসাধ্যসাধন করলেন মাস্টারমশাই, আমার ছেলে বলেই যে আপনার প্রাপ্য যশ থেকে আমি বঞ্চিত করব আপনাকে, তা করব না।"

খুব পদস্থ ব্যক্তি একজন,—রায় বাহাদুর, জমিদার, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, আরও অনেক কিছু। সবচেয়ে বড় কথা বঙ্গীয় জমিদার-সংঘের একজন হোমরা-চোমরা লোক, যেটুকু মুখে বলিলেন শুধু ঐটুকু কথাই যদি কাগজে লিখিয়া দেন তো কাজটার আমার অনেক আশা থাকে। কিন্তু জানি উনি তাহা করিবেন না।

তাহার কারণ এই যে আমি অসাধ্যসাধন করিতে পারি।

নিকুঞ্জর যেদিন পাশের খবর বাহির হইল, সেইদিন সন্ধ্যার সময়ই আমি ব্রজমাধববাবুর সহিত দেখা করিলাম, বলিলাম, "এইবার আপনি আমায় একটি ভালো সার্টিফিকেট দিন, অনেক দিন থেকেই আশা করে আছি, আপনি বলেছিলেনও দেবেন। আপনার একটা সার্টিফিকেটে আমার একটা ভবিষ্যৎ হয়ে যেতে পারে।"

ব্রজমাধব স্নেহভরে আমার কাঁধে দুইটি চাপড় দিয়া সস্মিত-বদনে কহিলেন, "পাবে হে ইয়ংম্যান্, ব্রজমাধব সে রকম আন্-এপ্রিসিয়েটিভ্ নয়, কাল সকালে দেখা কোরো।"

দেখা করিতে নিকুঞ্জের কনিষ্ঠকে আমার দিকে একটু আগাইয়া দিলেন, স্মিত-বদনেই বলিলেন, "এই তোমার সার্টিফিকেট; এটি আবার একটু বেশি ড্যল (dull); ভূপেশ বাবুর কর্ম নয়,—নিজের

ছেলে বলেই অযথা প্রশংসা করতে হবে তার মানে কি ?…আর এই ধরো, আসছে মাস থেকে আর পাঁচ টাকা বেশি পাবে।”

পুরস্কার স্বরূপ একটি মাসের মাহিনাও হাতে তুলিয়া দিলেন। উপায়ও নাই; তবুও তো কলিকাতা শহরে খাওয়া-পরা ছাড়া পঁচিশটি করিয়া টাকা মাহিনা পাইতেছি; না আছে স্থপারিশের জোর, না আছে কিছু, করিই বা কি? অথচ বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়াও রহিয়াছি—নিকুঞ্জলালের পর কুঞ্জলাল, তারপর রঞ্জনলাল, তার পর মঞ্জুলিকা সবাই এরা একে একে ঘাড়ে আসিয়া চাপিবে?—তুই তিন বৎসর অন্তর একমাসের বোনাস্ আর পাঁচটি টাকার বেতন বৃদ্ধি লইয়া। এই আমার জীবনের ভবিষ্যৎ। একটু বেশি ড্যল হইতে হইতে সব চেয়ে ছোট রঞ্জনলালটি আবার বোবা হইয়া জন্মাইয়াছেন।

কুঞ্জলাল জলখাবার খাইতে গিয়াছে; পড়িবার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া এ-বইটা সে-বইটা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছি, আর নানারকম চিন্তা লইয়া তোলাপাড়া করিতেছি। বিজ্ঞাপনটা দেখা পর্যন্ত মনটা বড় চঞ্চল হইয়া আছে, সব জিনিস্ যেন অত্যন্ত ফিকা বোধ হইতেছে। অবশ্য দুরাশা, তবুও যদি রায়বাহাদুরের একটা সার্টিফিকেট লইয়া দরখাস্তটা পাঠাইয়া দিতে পারিতাম তো ক'টা দিন আশায় আশায় কাটিত একরকম, আর তাহার পর বিফলমনোরথ হইলে ততটা কষ্টও হইত না—চেষ্টা করার একটা সান্ত্বনা থাকিত তো। এখন আফ্‌শোষ হইবে, চেষ্টা করিলাম না বলিয়াই হইল না।… একবার ভাবিতেছি নিজেই গিয়া দেখা করি; কিন্তু দেখা করিবার পাত্রও তো আমি একা নয়। আবার মনে হইতেছে চাই একটা সার্টিফিকেট, যা' হইবার হইবে। ভাবিয়া দেখিতেছি—'যা হইবার মধ্যে হয়তো নৈরাশ্যজনিত বিরক্তিতে একটু কথা কাটাকাটি হইয়া হাতের চাকরিটাই যাইতে পারে। নিজেকেই প্রশ্ন করিতেছি, “তোয়ের আছ তার জন্যে?—তা হ'লে দেখ।”

এই সময় নিকুঞ্জলালের হাউণ্ড কুকুর টম্ বাড়ির পোষা কাবুলী বেড়ালটাকে দেখিতে পাইল। টম্ তাহার প্রিয় আশ্রয় বইয়ের র‍্যাকের নিচেটিতে বসিয়া গরমে হাঁপাইতেছিল, বেড়ালটাকে নিশ্চিন্তমনে ল্যাজ খাড়া করিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া সহুংকারে লাফাইয়া উঠিয়াই পাঁচ-থাকা র‍্যাকের যত বই, খাতা, ম্যাপ, দোয়াতদানি, রুল, ইনস্ট্রুমেণ্টবক্স, সমস্তর নিচে চাপা পড়িয়া গেল।

যতক্ষণে উঠিল ততক্ষণে বিড়ালটা দোতলায় পৌঁছিয়া গেছে, সেখানে আলিসার একটি নিরাপদ কোণে গুটাইয়া বসিয়া ধীর অভিনিবেশের সহিত ঘরের দৃশ্যটি পর্যবেক্ষণ করিতেছে।

যাই হোক্, এই বিদ্যাসাগর মন্থনে আমার ভাগ্যে একটি রত্ন উঠিল। চাকরটা আসিয়া বই খাতাগুলা গুছাইয়া রাখিতেছিল, নিতান্ত অলস কৌতূহল বশেই আমি তাহার নিকট হইতে একখানি খাতা চাহিয়া লইলাম। নিকুঞ্জলালের বাংলা প্রবন্ধের খাতা, আজকের নয়, নিকুঞ্জ যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়িত সেই সময়ের। নিজের কীর্তির আলোচনায় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিলাম, আর যাই হোক্ না হোক্, হাতের লেখাটা নিকুঞ্জর মানুষের মতো হইয়াছে।

…অনেকগুলি প্রবন্ধ—ঘোড়া, গরু, হস্তী, সত্যবাদিতা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সিংহ, উষ্ট্র—সবগুলার নিচে একদিকে নিকুঞ্জলালের নাম, লেখার তারিখ, অপরদিকে স্কুলের শিক্ষকের দস্তখৎ, তারিখ সমেত। একটিও প্রবন্ধের গায়ে এতটুকু সংশোধনের আঁচড় নাই দেখিয়া কৌতূহল হওয়ায় দু'একটা পড়িয়া দেখিলাম সবগুলি কোন প্রবন্ধের পুস্তক থেকে যথাযথভাবে নকল করা। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ চোখে পড়িয়া গেল—"মনুষ্য"। ঝোঁকের উপর উল্টাইয়াই যাইতেছিলাম, বারো-চৌদ্দখানা পাতা যখন উল্টাইয়া গেছি, হঠাৎ বড় কৌতূহল হইল। "মনুষ্য" সম্বন্ধে প্রবন্ধ ইস্কুল-ছাত্রদের গণ্ডির মধ্যে পড়ে

না, ও লইয়া কলম চালাইবার সাহস করিতে পারে কার্লাইল, বেকন, হাক্স্‌লির মতো মানুষই। স্কুলের প্রবন্ধ-পুস্তকেও মানুষ লইয়া কোন প্রবন্ধ কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। শিক্ষকের বিষয় নির্বাচনের তারিফ করিয়া আবার পিছন দিকে পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিলাম—নিকুঞ্জলালই বা কি লিখিল, শিক্ষকই বা কি পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিলেন একবার দেখিতে হইল তো!

প্রবন্ধের শেষ পাতাটিতে আসিলাম—শিক্ষকের দস্তখতে লেখা রহিয়াছে, "তুমি একটি আস্ত গর্দভ";—কোন খানে কাটাকুটি কিছু নাই। বুঝিলাম এই এতগুলি রচনার মধ্যে এইটিতে যখন নিকুঞ্জের স্বকীয় রূপ শিক্ষকের নিকট ধরা পড়িয়াছে, তখন এটি নিশ্চয় মৌলিক। প্রবন্ধটি পড়িতে লাগিলাম, যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, বুঝিলাম—বইয়ে কোথাও না পাওয়ায় গরু, ঘোড়া, উষ্ট্র, সিংহের আদর্শে নিকুঞ্জ প্রবন্ধটি সত্যই নিজেই আগা-গোড়া লিখিয়া গিয়াছে, হয়তো শিক্ষক আলগাভাবে ঐরকম একটা নির্দেশ দিয়া থাকিবেন, অর্থাৎ—জীব জগতের এতগুলি জীব সম্বন্ধে যখন প্রবন্ধ লিখিয়াছে, তখন সেই আদর্শে মনুষ্য সম্বন্ধেই বা পারিবে না কেন? যাই হোক, সেটা আমার আন্দাজ—আপাতত মূল প্রবন্ধটা এখানে তুলিয়া দিলাম।

"মানুষ দুই পদের জন্তু। তাহার সামনের দুইটিকে হাত বলা হয়, নতুবা সে চতুষ্পদ হইতে পারিত। মানুষ বনমানুষ, সার্কাসের ভাল্লুক প্রভৃতির ন্যায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চলিতে ভালোবাসে। মানুষের দুইটি কান, দুইটি চোখ এবং একটি নাক আছে। ইহাদের মাথায় সিং নাই, তবে রাজপুতানার দিকে এক জাতীয় মানুষ পাওয়া যায় তাহাদের সিং বলে। তাহারা যুদ্ধের দ্বারা প্রাণ ধারণ করে এবং তাহাদের স্ত্রীরা আগুনে ঝাঁপ দেয়। মানুষের লেজও নাই, এইজন্য ইহাদের পাখা দিয়া মশামাছি

তাড়াইতে হয়। মানুষ কাঁচা আম, পেঁপে, জাম, আনারস, মধু প্রভৃতি খাইতে বড় ভালোবাসে, নটে শাক, পালং শাক, আলু, পটল, মাছ, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি রন্ধন করিয়া খায়। ইহারা গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতির মতো জাবর কাটিতে পারে না, তবে পান চিবায়, বিশেষ করিয়া স্ত্রী মানুষেরা। ইহাদের মেয়েমানুষ বলা হয়; যে মানুষেরা রন্ধন করে তাহাদের ঠাকুর বলে। ঠাকুর মুসলমান হইলে তাহাকে বাবুর্চি বলে। বাবুর্চি ঠাকুরের পৈতা থাকে না। তাহারা কাছাও দেয় না, টিকিও রাখে না—তাহার বদলে দাড়ি রাখে।

"মানুষের খুর নাই, সেইজন্য সে জুতা পরে। মেয়ে মানুষেরা জুতা পরে না, তবে মেম, চীনা প্রভৃতি কয়েক রকম মেয়েমানুষ জুতা পরিয়া থাকে। মানুষে চুল আঁচড়াইতে অত্যন্ত ভালোবাসে। ইহাকে ফ্যাশান বলে। জামা কাপড় প্রভৃতিকেও কখন কখন ফ্যাসান বলা হয়। পাম্প্-সু, এলবার্ট-স্থ, স্নো, পাউডার প্রভৃতিকেও কেহ কেহ ফ্যাশান বলেন।

"মানুষ পূজা করিতে ভালবাসে। যে মানুষেরা পাঁটা খাইতে ভালবাসে, তাহারা কালীপূজা করে। যে মানুষ পাঁটা খায় না তাহাকে বোষ্টম বলে। বোষ্টমদের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের অনেকগুলি বিবাহ ছিল।

"মানুষ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার জঙ্গল প্রধান। ইহারা কথা কহিতে পারে। মানুষ দুই প্রকার—বনমানুষ ও ভালোমানুষ। যাহারা জামা-কাপড়-প্যান্টালুন-টুপি প্রভৃতি পরিতে শিখিয়া দাড়ি কামাইয়া শহরে আসিয়া গিয়াছিল তাহারা ও তাহাদের সন্তানেরা ভালোমানুষ। যাহারা পারিল না তাহারা বনমানুষ হইয়া রহিল। এই বনমানুষকে মানুষের প্রপিতামহ বলা হয়। ভালোমানুষের সন্তানেরা পড়াশুনা করে এবং পরিখ্যা দেয়। ইহার জন্য পাঠশালে গুরুমশাই এবং স্কুলে মাস্টারমশাই বলিয়া

একজন রাগী মানুষ থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দাড়ি নামক মুখে একরূপ পদার্থ রাখে। আমাদের প্রবন্ধের মাস্টারমহাশয় রাগী নহে।

"মানুষের চামড়ায় ঘোড়ার জিন সুটকেশ প্রভৃতি কিছুই তৈয়ার হয় না। এইজন্য মানুষ মরিলে তাদের পুড়াইয়া ফেলা হয়। মানুষের উপরে ষোলটি ও নিচে ষোলটি দাঁত আছে, সেগুলি চিবাইবার ও হাঁসিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।..."

সবটা তুলিয়া দেওয়ার দরকার নাই। এইরকম মানুষের আয়ু, মেয়ে মানুষের একেবারে কয়টি করিয়া সন্তান হয়, মানুষের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অভ্যাস—সব খুঁটিয়া খুঁটিয়া ধরিয়া দিয়া ছয় পাতায় বেশ একটি মাঝারি সাইজের প্রবন্ধ শেষ করিয়াছে। সমস্তটি তাহার উর্বর মস্তিস্ক থেকে বাহির করা, অবশ্য আদর্শ পাইয়াছে গরু, উষ্ট্র, সিংহের নিকট।

তীব্র ক্ষোভে মনটা ভরিয়া উঠিল; এই চীজের পিছনে প্রাণান্তকর খাটুনি খাটিয়া আজ তিন বৎসরের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয়িত করিয়াছি! পুরস্কার এক মাসের মাহিনা পঁচিশটি টাকা, আর পুরস্কারের আবরণে অভিশাপ—তাহারই ভাই এই কুঞ্জলাল!

ভাবিতে ভাবিতে মনটা সত্যই বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। ঠিক করিলাম যদি বচসাই হয়, চাকরিই যায় তো যাক্, সার্টিফিকেট চাহিবই। স্পষ্টই বলিব রাজভাষায় যাহাকে সার্টিফিকেট বলে নিতান্ত তাহাই, চাহিতেছি, নিকুঞ্জের কনিষ্ঠ কুঞ্জলালকে নয়। না দেয়, এ-সার্টিফিকেট ফিরাইয়া দিব, তাহাতে উপবাস করিয়া মরিতে হয় সেও ভাল।

এই সব চিন্তার মধ্যেই মাথায় সম্পূর্ণ একটা অন্য ধরণের মতলব ধীরে ধীরে উদয় হইয়া বেশ জাঁকিয়া বসিল।...ভাবিলাম, দেখাই যাক না একটু চেষ্টা করিয়া, কাজ কি রায়বাহাদুরের খোসামোদে?

প্রবন্ধের পাতা কয়টি পরিষ্কার করিয়া কাটিয়া পকেটে পুরিলাম। চাকরকে বলিলাম, "কুঞ্জ এলে বলিস্, মাস্টারমশাইয়ের মাথাটা হঠাৎ

ধরে উঠল বলে চলে গেছেন, পড়াশুনোগুলো নিজেই একটু দেখে শুনে নিতে।"

বাসায় আসিয়া একটি দরখাস্ত করিলাম। সার্টিফিকেট হিসাবে নিকুঞ্জলালের প্রবন্ধটি নথি করিয়া নিয়া তাহার গায়ে লিখিয়া দিলাম— "সপ্তম শ্রেণীতে যে ছেলেটির প্রতিভার নমুনা এই, তাহাকে তিনবৎসরের অমানুষিক পরিশ্রমে আমি এই বৎসর পাশ করাইয়াছি,—সেকেণ্ড ডিভিশানে! ইহার অতিরিক্ত সার্টিফিকেট চাহিলে সংগ্রহের প্রয়াস করিতে পারি ; তবে এত প্রামাণিক হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।"

নিকুঞ্জর বংশ পরিচয় একটু একটু দিলাম, যাহাতে মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ না করে, আর খবরের কাগজ থেকে তাহার ইস্কুলের ফলাফলের অংশটুকু কাটিয়া তাহার নামের নিচে লাল দাগ টানিয়া সার্টিফিকেটের সঙ্গে জুড়িয়া দিলাম।

আজ সকালে নিয়োগপত্র পাইয়াছি,—টেলিগ্রাম অর্থাৎ, এসব অসাধ্য-সাধন যে মাস্টার করিতে পারে সে যেন হাতছাড়া না হইয়া যায়।

শনিবার

নিকুঞ্জর শ্বশুরবাড়ি তাহাদের গ্রামেই ; গ্রামে বলি কেন, পাড়াতেই। নিকুঞ্জদের বাড়ি, তাহার পরেই দত্তদের বড় পুকুর, পুকুরের ওপারে গৌরাঙ্গের মন্দির সংলগ্ন খানিকটা খোলা জায়গা, তাহারই এক কোণ হইতে একটা পায়ে হাঁটা পথ বাহির হইয়া গিয়াছে। সেটা ধরিয়া একটু গেলেই সরমাদের বাড়ি।

ইহা হইতে সন্দেহ হইতে পারে তবে বোধ হয় এ-বিবাহে পূর্বরাগের ব্যাপার ছিল। কিন্তু ও-ধরণের কিছুই ছিল না, কেন না কাছে কাছে থাকিলেই যে সব সময় দূরে থাকা হইল না, সব ক্ষেত্রে এটা সত্য নয়। পাড়ায় সুন্দরী কিশোরী থাকিলে অবশ্য তাহার ছায়া মাড়াইয়া একটু ঘুরিতে ইচ্ছা করে ; নিকুঞ্জবিহারীরও একসময় করিযাছিল, কিন্তু এ-ভাবটা স্থায়ী হইবার সুযোগ পায় নাই, কারণ মেয়েটি অত্যন্ত কলহপ্রিয় এবং নিকুঞ্জ অত্যন্ত রোখা।

এ অবস্থায় বিবাহের কোনই সম্ভাবনা ছিল না ; কিন্তু নিজের স্থষ্টির গলদ বুঝিয়া এ ব্যাপারটা এখনও নাকি বিধাতাপুরুষ একেবারেই নিজের হাতে রাখিয়াছেন, সেইজন্য কি নিগূঢ় উপায়ে হইয়াই গেল বিবাহটা।

এক বৎসরও হয় নাই এখনও, কিন্তু কলহ এবং মনকষাকষির বহরটা দেখিলে মনে হইবে ইহাদের যেন চার পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়া গেছে। তবু যদি মাসের মধ্যে কুড়িটা দিন অদর্শনে না কাটিত !

নিকুঞ্জ কলিকাতায় কাজ করে, ছয়টা দিন সেখানে কাটাইয়া শনিবার

দিন বাড়ী আসে ; রবিবারটা থাকিয়া আবার সোমবার সাতটা-তিনের গাড়ীতে ফিরিয়া যায়।

এই দ্বিধাবিভক্ত জীবনের রুটিনও মোটামুটি বাঁধা। কলিকাতার ছয়টা দিন—দিনের বেলায় আফিসের চিন্তা, রাত্রে শনিবারের পর্যালোচনা,—সরমার কথার কি উত্তরটা দেওয়া উচিত ছিল অথচ সে সময় দেওয়া হয় নাই। সরমার উপর এর প্রভাব কি হইবে? নিশ্চয় ভাবিবে যে নিকুঞ্জ দুর্বল প্রকৃতির, অন্তত ক্রমে দুর্বল হইয়া আসিতেছে। অথচ সে দুর্বল মোটেই নয়। এইবার গিয়া সেটা জানাইয়া দিবে, সুদে আসলে। সেই পুরাণো কথার সূত্রটা তাহা হইলে কোথায় ধরিতে হইবে?…কখন কখন মনটা বিষণ্ণও হয়,—আহা, বড় কড়াভাবে বলা হইয়া গিয়াছিল। একটু রাগী সরমা, তা নিকুঞ্জকেই তো ভুলাইয়া-ভালাইয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া ওকে মানুষটি করিয়া তুলিতে হইবে? আহা, এবারে গিয়া ওর সব গ্লানি মুছিয়া লইবে নিকুঞ্জ, নিজে একটু নিচু হইয়াও। অপমান না হাতী, ওরকম একটু-আধটু সহিতেই হয়, আর কেই বা দেখিতে যাইতেছে?

শনিবারে বাড়ি আসিয়া আবার যেকে সেই—সামান্য একটা অছিলায় রাগ, অভিমান, বচসা, কথা বন্ধ। সমস্ত রবিবারটা দুজনের মুখভার, সোমবার ভোরে আবার ছাড়াছাড়ি।

না, এরকম ভাবে আর চলে না, চলা উচিতও নয়। এই সোমবার ভোরটা কেমন হঠাৎ বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল, সেইজন্য বিদায়ের সময় দুইজনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। একটা অভিনব অনুভূতি!

সেই স্মৃতিটুকু কলিকাতার সমস্ত সপ্তাহটি যেন অশ্রুসজল করিয়া রাখিয়াছিল, এবারে একটা দিনের জন্যও নিকুঞ্জ প্রতিশোধ কিংবা শাসনের কথা মনে আনে নাই।

শনিবার। নিকুঞ্জ আজ একটু সকাল সকাল আফিস হইতে ছুটি লইবে। সরমাকে অনেকদিন কিছু দেওয়া হয় নাই। আজ গোটাকতক

সৌখীন জিনিস লইবে, তাহার পর পারে তো সাড়ে-চারটার গাড়িটা ধরিবে। ছয়টার গাড়ি ধরিয়া অত রাত করিয়া পৌছাইলে, না থাকে সময়, না থাকে একটা উৎসাহ, ঠিকমতো পাওয়াই যায়না সরমাকে।

সকালে ছুটি লইতে বাধা অনেক অবশ্য। প্রথমে বড়বাবুর মানসিক ডিসপেপ্‌সিয়ার কথা তুলিয়া নানাভাবে খোসামোদ করা, টোটকা আর নূতন নূতন সাধু-অবধূতদের সন্ধান দাও। তাঁহাকে দ্রব করিয়া ডিপার্টমেন্টের হেড্‌ মেজবাবুর কাছে এস ; সেখানে তাঁহার হাতের মাস্‌ল্‌ আর বুকের ছাতির প্রশংসা করিয়া, বড়বাবুর প্যান-প্যানানির নিন্দা করিয়া খানিকটা গালমন্দ দাও। দুইটার একটাও ভালো লাগে না নিকুঞ্জর। আজ কিন্তু সরমার উপর মনটা অতিরিক্ত ভালো থাকায় দুইটাই ভালো লাগিল। দেড়টার সময় ছুটি লইয়া নিকুঞ্জ এক বাক্স সাবান, এক পট্‌ ফেস্‌-ক্রীম, একটা ভালো ফুলেল তৈল এবং খানকতক লোমহর্ষক ডিটেক্টিভ উপন্যাস খরিদ করিল, এবং সাড়ে-চারটার ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার ধরিয়া সকাল সকাল বাড়ি পৌছিল।

জিনিস দেখিয়া সরমা খুশি হইল। হাসিয়া বলিল, "কি যে ছাই একরাশ খরচ করে এলেন বাবু!"

"খরচ তো ভারি! কখনও একটু সময় পাই না যে পছন্দ করে এক আধটা জিনিস নিয়ে আসব তোমার জন্যে। আজ দু'বেটা ভুঁদোর অনেক খোসামোদ করে একটু ছুটি নিয়ে···

সরমা হাসিয়া বলিল, "ভালোও লাগে তোমাদের এত খোসামোদ করতে যার-তার?"

নিকুঞ্জ ওই সুরেই বলিল, "না করলে মন পাওয়া যায়? অমন জিনিস আছে খোসামোদের মত? নিজের থেকেই বোঝ না।"

ফেস্‌-ক্রীম্‌টার ঢাকনা খুলিয়া সরমার নাকের দিকে বাড়াইয়া বলিল, "দেখ কেমন গন্ধটা! ফ্রেঞ্চ ক্রীম—খুব সৌখীন জাত কিনা।"

সরমা মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "থাক, ঢের হয়েছে!"

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া নিকুঞ্জ প্রশ্ন করিল, "কেন, কি হ'ল আবার?"

"কিছু না।"

নিকুঞ্জ আকুলভাবে মনে মনে একটু চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "হয়েছে নিশ্চয় কিছু, না হ'লে…"

"কিছু হয়নি, সে ভয়ে তোমায় যার-তার খোসামোদ করতে হবে না।"

"ও! তা 'যার-তার' আমি তোমায় বললাম?"

সরমা মুখ রাঙা করিয়া বলিল, "বললে।"

"বললাম? খুব লোক ত তুমি! পরের গালাগাল গা পেতে…"

ইহার পর যাহা হইল তাহাকে উত্তাপ এবং বিনাশের দিক দিয়া অগ্নিকাণ্ড বলা চলে।…"ওগো, আমি চাই না কারুর ভালোমন্দ কোন জিনিস গা পেতে, কি হাত পেতে, কি মাথা পেতে নিতে; সরাও, সরিয়ে নাও সব, শীগ্‌গির সরিয়ে নাও!…"

বিলম্বটা অসহ্য হওয়ায় হাতের এমন একটা ঝাঁকানি দিল যে অমন দরদ দিয়া আহৃত সমস্ত জিনিসগুলা ঘরময় ছড়াইয়া ছত্রাকার হইয়া গেল। ফ্রেঞ্চস্নোর শিশিটা ভাঙিয়া গিয়া একটা মিষ্ট মৃদু সৌরভ ব্যঙ্গের হাসির মত ঘরটার কোথায় যেন একটু লাগিয়া রহিল।

দুই মিনিটও সহিল না ঐ ক্ষণভঙ্গুর কাচের মতই গোটা সপ্তাহের যত আশা কল্পনা অবুঝ দুইটি কথার ঘায়ে ভাঙিয়া পড়িল। এদের ধারাই এই।

সমস্ত রাত কথা বন্ধ; সমস্ত দিন মুখ দেখাদেখি নাই। রাত্রে কাছাকাছি হইবার ভয়ে নিকুঞ্জ বাহিরের ঘরে বিছানার বন্দোবস্ত করিল। সরমাও বসিয়াছিল না। বিছানাপত্র সারিয়া একটা পান মুখে গুঁজিয়া নিকুঞ্জ বাহির হইবে, এমন সময় তাহার ছোট শালী তাহার শিশু শ্যালকটিকে কাঁকালে বহিয়া দুয়ারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং একটু

হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করিল, "জামাইবাবু, ঠাকুরমার অসুখটা বেড়েছে, তাই দিদিকে একবার দেখতে চাইছেন; যদি বলেন তো..."

নিকুঞ্জ সরমাকে খুব জব্দ করিতেছে ভাবিয়া অনেকটা সন্তুষ্টচিত্তে আড্ডায় বাহির হইতেছিল, সরমার চালের বহর দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া একটু দাঁড়াইল। একবার মনে হইল, নিজে গিয়া দেখিয়া আসিবার কথা তুলিয়া সব চাল ফাঁস করিয়া দেয়, কিন্তু রোখা লোক, সেটা করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না।

"তা যাক্ না, আমায় জিজ্ঞেস করা কেন?"—বলিয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু নিকুঞ্জর মাথার উপর লোক আছেন; এবং তাঁহাদের মাথা এত গরম নয়। সরমার আর সুস্থ ঠাকুরমার রোগ পরিচর্যায় যাওয়া হইল না।।

যদিও ইহাতে কিছু ইতর-বিশেষ হইল না। নিকুঞ্জ ভোরে বাহিরের ঘরেই শয্যাত্যাগ করিয়া মুখ-হাত ধুইয়া বাহিরের ঘরেই জলযোগ করিল, এবং নিজের উগ্র পৌরুষের নিদর্শনস্বরূপ পানের ডিবাটি পর্যন্ত না লইয়া বাহিরের ঘর হইতেই আফিস যাত্রা করিল।

ভাজ, বোন, শালী—যাহারা মধ্যস্থতার প্রয়াস করিয়াছিল, ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "এক পক্ষও নরম হয়, সামলানো যায়; এ যেন কাঠে কাঠে!"

তাহার পর প্রতি সপ্তাহের চিরন্তন ইতিহাস আবার আরম্ভ হইল।

বাড়ি হইতে যে আক্রোশ লইয়া বাহির হইয়াছিল সেটা দূরত্বের সঙ্গে ক্রমশই উগ্রতর আকার ধারণ করিতে লাগিল। যখনই কোন কারণে সেটা স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল, অন্যমনস্কভাবে পানের ডিবার জন্য পকেটে হাত দিতেই আবার ভীষণতর আকারে মাথায় জাঁকিয়া বসিতেছিল।

ক্রমে সরমাকে কেন্দ্র করিয়া যে বেপরোয়া ভাবটা জাগিয়া উঠিয়াছিল সেটা কম্বু-বৃত্তাকারে বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত পৃথিবীটি বেষ্টন করিয়া ফেলিল ; নিকুঞ্জ কাহাকেও পরোয়া করে না, সরমার, কি টিকিট-চেকারের, কি বড়বাবুর তো নয়ই, এমন কি ঈশ্বরের পর্যন্ত নয়। ঈশ্বর নাই, থাকিলেও তাঁহার সৃষ্টিতে যদি এক ফোঁটা মেয়ের অত তেজ থাকে তো সে রকম ঈশ্বরকে সে গ্রাহ্য করে না, সে রকম ঈশ্বরকেও নয়, আর তাঁহার সৃষ্টিকেও নয়।

সোমবারটা গেল ; নিকুঞ্জ স্থির করিয়াছে এ শনিবারে বাড়ি যাইবে না। কি দরকার? একটা দুর্বলতা বই তো নয়। বরং হুট করিয়া ঝোঁকের মাথায় অনর্থক যে সেদিন ছয়টা টাকা খরচ করিয়া ফেলিল, গাড়ির ভাড়া বাঁচাইয়া সেটা তুলিয়া লইলে বরং একটা কাজ হইবে, আর কিছু না হউক, পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো হইবেই। এ শনিবার যাইবে না, এর পরের শনিবারও নয়। ধরো যদি সে এই মাসটাই আর না যায়।

এর ফল নিকুঞ্জ মনে মনে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিল, সরমা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, শোবার ঘরে তাহার ফটোটার দিকে হাতযোড় করিয়া ক্রমাগতই মিনতি জানাইতেছে—এই রকম গোছের একটা চিত্র খাড়া করিবার তাহার ইচ্ছা ; কিন্তু কোনমতেই কৃতকার্য হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহার চোখের সামনে একটা দেয়ালপঞ্জীতে ঘোড়সওয়ারি বুট আর ব্রীচেস পরা এক মেমসাহেব ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া দর্পিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে ; এই ছবিটার জন্যই হউক বা অন্য কারণেই হউক তাহার কল্পনার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া সে রাত্রের সরমার সেই বেপরোয়া ভাবটা যেন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

মঙ্গল আর বুধবারটা অনেকটা এইভাবে গেল। সমস্ত দিন যাওয়ার কথাটা মনে স্থান না-দেওয়ার চেষ্টায় মনটাতে আর অন্য কোন কথাই স্থান

পাইল না। না-যাওয়ার পক্ষে বৃহস্পতিবার দিন আবার মস্ত একটা সুযোগ ঘটিয়া গেল।

আফিসে গিয়া দেখিল কেরানি-মহল সরগরম—মেজবাবু একটা হুজুগ তুলিয়াছেন, এই রবিবার পেনিটিতে গিয়া বনভোজন। বড়বাবুর মারফৎ একটা বাগানবাড়ি যোগাড় হইয়াছে। ট্রেনে যাওয়া নয়, ভোরের জোয়ারের সঙ্গে নৌকা ছাড়িয়া বেলা আটটা নাগাদ সেখানে পৌছানো। সমস্তদিন সেইখানে অবস্থান, সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নায় ফিরিয়া আসা। আফিসে অন্য কথা নাই, সামনে লেজার কাগজপত্র সব খুলিয়া রাখিয়া চাপা গলায় শুধু নানা প্রকারে এই চর্চাই চলিতেছে ; খাবারের মেনু, চাঁদার ফর্দ, বড়বাবুর বৈরাগ্য, সাহেবের মোটা চাঁদা···

পাশের ডেস্ক হইতে মুটবিহারী কলম তুলিয়া আড়চোখে চাহিয়া বলিল, "ফ্যাসাদ নয় কি ? একটা শনিবার বাদ গেলে সমস্ত মাসটা মান ভাঙাতেই কেটে যায়। এদিকে নতুন চাকরি, মেজবাবুকেও চটাতে সাহস হয় নয়। এখন শ্যাম রাখি, কি কূল রাখি ? আপনারও তেং একই অবস্থা ?

নিকুঞ্জ তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিল, "অত ভয় করি না মশায়। প্রাণ যা চায় তাই করবে নিকুঞ্জ শর্মা, যার পছন্দ না হয় সে একমুঠো বেশি করে ভাত খাক।"

মুটবিহারী কালিশুদ্ধ কলমটা লেজারের পাতায় ঠুকিয়া বলিল, "আমারও সেই কথা। তুমি মেজবাবু আছ তো নিজের ঘরে আছ, আমার প্রাইভেট লাইফের···"

"আমি বলছিলাম, গিন্নীর কথা। শনিবারে শনিবারে গিয়ে যে শ্রীচরণে হাজরি দিতে হবে, এমন কিছু দাসখত লিখে দিই নি তো মশায় ! কেন, নিজে একটু ফুর্তি করব না ? ও মশায়, যতই নাই দেবেন তত মাথায় উঠবে। আমায় দিন না ফি শনিবারে এই রকম একটা পার্টির বন্দোবস্ত

করে, বছর খানেক কলকাতা কামড়ে পড়ে থাকব। আমায় সে বান্দা পান নি। আমি তো খুঁজছিলাম এই! ফি শনিবার যাও, সোমবার এস, শনিবার যাও, সোমবার এস—কেন রে বাপু?"

মুটবিহারী ঘাড় নিচু করিয়া লেজারে জমা ঠিক দিতে লাগিল।

তাহার পরের দিন আফিসে আসিয়াই নিকুঞ্জ নিজের চাঁদার দরুণ দুইটা টাকা মেজবাবুর হাতে দিল এবং পিকনিকের জন্য চাঁদা তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া সব ব্যাপারে এমন উগ্রভাবে মাতিয়া গেল যে আর সবাই, এমন কি মেজবাবু পর্যন্ত যেন পিছনে পড়িয়া গেলেন। তিনি একবার আশ্চর্য হইয়া বলিলেনও, "নিকুঞ্জবাবুর যে এসব কাজে এত উৎসাহ তা জানতাম না। শনিবারের যাত্রীদের তো আমি আলাদা জীব বলেই ধরে রেখেছিলাম। দুটো দিন বাড়িতে, বাকি পাঁচটা দিন বাড়ির চিন্তায়, এই তো তাদের জীবন।...নাঃ, আপনার উৎসাহ দেখে যেমন ভুল ভাঙল, সঙ্গে সঙ্গে বড় আনন্দও হ'ল। এই তো চাই। হোম্-সিক্ জাত হয়েই তো আমরা মারা গেলাম মশাই!"

নিকুঞ্জ প্রশংসিত উৎসাহের ভরে বলিল, "আপনি বলতে মনে পড়ল, নইলে বাড়ী বলে যে একটা জিনিস আছে সেটা তো মনেই ছিল না, স্যার।"

"না, আমার কথা হচ্ছে—বাড়িও চাই, আবার এ-সবও চাই; নইলে শুধু বাড়ি আর আফিস, বাড়ি আর আফিস করলে শরীর টেঁকবে কেন মশাই?...এই দেখুন টিপে হাতের মাস্‌ল্, দেখছেন তো? আফিস থেকে সিধে রোইং ক্লাব, সেখান থেকে ব্যায়াম সমিতি, সব সেরে নটার সময় বাড়ি পৌছানো, আহার, নিদ্রা। রাত যে কোন দিক দিয়ে কেটে গেল হুঁসই থাকে না?...আর ঐ দেখুন না, দিনদিন জালার মতো ভুঁড়ি হচ্ছে আর ডিস্‌পেপসিয়া আর ডিস্‌পেপসিয়া! আরে ছ্যাঃ!"

হলের ও প্রান্তে বড়বাবুর আস্তানা, মৃদু হাস্যের সহিত সেই দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া নিকুঞ্জ মাথাটা নিচু করিল।

মেজবাবু প্রশ্ন করিলেন, "হুটবিহারীটার খবর কি? হ'ল সে রাজি? চাঁদা দেয় নি তো?"

"অনেকটা রাজি করে এনেছি স্যার। ফেরবার সময় বাড়ি গিয়ে আরও খানিকটা ভুজুংভাজুং দোব। লোকটা একটু যাকে বলে স্ত্রৈণ, স্যার!"

শুক্রবার সন্ধ্যার সময় মেজবাবু ও অন্যান্য কয়েক জনের সঙ্গে বাজার সারিয়া, সেই উৎসাহের মুখেই নিকুঞ্জ হুটবিহারীর বাড়ি গেল এবং তাহার নিকট চাঁদার দরুণ দুইটা টাকা আদায় করিয়া মেসে ফিরিল।

শরীরটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। হাত-পা ধুইয়া একটু জলখাবার খাইল, তাহার পর গোটানো বিছানায় হেলান দিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া তক্তপোষের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

রং-বেরঙের চিন্তা—পেনিটির গঙ্গাতীর, মেজবাবুর হাতের পেশী, ফিরিবার সময় গঙ্গার উপর জ্যোৎস্না; বড়বাবুর চকচকে টাক··· লোকটা কিন্তু এদিকে ভালো বেশ ভালো মনে বাগানবাড়িটা যোগাড় করিয়া দিল।···হুটবিহারীটা কি স্ত্রৈণ! পরন্তু এদিকে ইহারা যখন স্ফূর্তি করিতেছে, তাহার সেই একঘেয়ে কাণ্ড, বোধ হয় স্ত্রীর মনটা সোমবারের বিচ্ছেদের জন্য ভারাক্রান্ত; হুটবিহারীও সেই করুণ সুরে মনের তন্ত্রী বাঁধিয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। নিশ্চয়। হুটবিহারীর বউকে কেমন দেখিতে হয়, মনটা ভার-ভার থাকিলে? সরমার মতো কি? সরমাকে সে সময় দেখিলে বড় কষ্ট হয়···

সেই ব্রীচেস্-পরা মেমের ছবিটা হাওয়ায় উল্টাইয়া গিয়াছে। তাহার এপিটে, সাদা কাগজের গায়ে একটি বিষণ্ন মুখ ক্রমশ খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিল··· সরমার মুখ, সরমার অভিমান হইয়াছে···

ঠাকুর আসিয়া বলিল, "বাবুরা সব সকালসকাল খেয়েদেয়ে সিনেমা যাবে, আপনাকেও দিয়ে দিই, নয়তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

নিকুঞ্জ বিরক্তভাবে বলিল, "যাক গে।"

আচ্ছা, সরমার দোষটা কি? সেই খোসামোদের কথা! না, সরমার অতটা রাগ করা উচিত হয় নাই, তবে নিকুঞ্জরও 'যার-তার' কথাটা ব্যবহার করা কি ভালো হইয়াছে? যদিও ব্যবহার আসলে সরমাই করিয়াছিল, কিন্তু তাহার উত্তরটা কি সত্যই অনেকটা সায় দেওয়ার মতো হয় নাই? অবশ্য খুব টানিয়া-বুনিয়া তবে মানেটা ঐ রকম দাঁড়ায়, তা যাহার একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে সে একটু টানিয়া-বুনিয়াই মানে করিবে বই কি? সরমা যে খুব বুদ্ধিমতী একথা কি অস্বীকার করা চলে? ধর্মে সহিবে কেন? ধর্মতই যদি দেখা যায় তো, সব কথা ছাড়িয়া দিলেও সরমার প্রতি তাহার আচরণটা কোন্ ভালো হইয়াছে? পরে রাতটা বাহিরে শোওয়া কি ভালো হইয়াছিল? মনোমালিন্য কাটিবার যে অবসরই দিল না সে! দোষটা কাহার? তাহার পর সেই পানের ডিবাটা পর্যন্ত ছাড়িয়া আসা! না, তাহার আর সরমার উপর দোষ চাপাইবার মুখ নাই। তাহার উপর আবার এই শনিবারের না যাওয়া···

এইখানে আসিয়া নিকুঞ্জর চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর খানিকক্ষণ ধরিয়া একটা আবর্ত সৃষ্টি করিয়া আবার অন্য পথে চলিল।

এই আবার এক হাঙ্গামা জুটিয়াছে—পিক্‌নিক পার্টি! ভালও লাগে না, মেজবাবুটা যেন দিন দিন খোকা হইতেছে! মস্ত অপরাধ নুটবিহারীর! সারা সপ্তাহটা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া দুই দিনের জন্য বাড়ি যাইবে, না আটকাও তাকে, চাঁদা আদায় কর, বাজার করাও।···রোইং ক্লাব! হাত যেন হইয়া পড়িয়াছে চাষার মত! অমন বজ্রের মত মুষ্টি দিয়া সরমার হাত ধরিতে গেলেই হইয়াছে আর কি! একে তো নিকুঞ্জর মত নিষ্ঠুর, জেদী, অবিবেচক, অপদার্থ লোকের হাতে পড়িয়া এমনই সে বেচারীর দুর্দশার অবধি নাই···

দেওয়ালপঞ্জীর কার্ডবোর্ডে সরমার মলিন মুখখানি আবার স্পষ্ট হইয়া

উঠিল। আহা, ছেলেমানুষ সরমা, সংসারের কিছুই জানে না, নিরপরাধিনী।

পরের দিন শনিবার। পিকনিকের তোড়জোড়ের উৎসাহ আফিসে আরও জোরে চলিয়াছে। মেজবাবু আসিয়া নিকুঞ্জর ডেস্কের সামনে দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "তা হ'লে নিকুঞ্জবাবু, সব ঠিক তো?"

নিকুঞ্জ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিষণ্ণভাবে মাথাটা নীচু করিল।

মেজবাবু একটু শঙ্কিত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপার কি? শরীর ভালো আছে তো?"

আজ সকাল থেকে ভগবান নিকুঞ্জর প্রতি একটু সদয় হইয়াছেন। মেসের ম্যানেজার বলরামবাবুর বাড়ি থেকে একটি টেলিগ্রাম আসিয়াছে— জেঠাইয়ের ভয়ানক অসুখ। টেলিগ্রামটি বলরামবাবু টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়াই বাড়ি চলিয়া গিয়াছেন। নিকুঞ্জ নামটি সযত্নে রবার দিয়া ঘষিয়া বদলাইয়া লইয়াছে।

"নিজে তো ভালো আছি স্যার, কিন্তু এই দেখুন বিপদ।"—বলিয়া টেলিগ্রামটি পকেট হইতে বাহির করিয়া মেজবাবুর হাতে দিল।

"তাই তো! কি হয়েছে তাঁর?"

যাহাতে টেলিগ্রাম সত্ত্বেও আবার কোন বাধা আসিয়া না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে নিকুঞ্জ বলিল, "আগে একটা চিঠি এসেছিল, হঠাৎ বুকে ঠাণ্ডা লেগে জ্বরের মতো হয়েছে। ভয় হচ্ছে নিউমোনিয়া না হয়ে থাকে।"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

নিউমোনিয়াই হইয়াছে নিশ্চয়। তবে আশ্বস্ত করিবার জন্য মেজবাবু, বলিলেন, "না, নিউমোনিয়া কেন হবে? সেইটেই একটু বেড়েছে বোধ হয়। তবু বড়বাবুকে বলে দিচ্ছি, আপনি সকাল সকালই চলে যান। আপনি থাকলে পিক্‌নিক্‌টা জমত ভালো।"

"অদৃষ্ট স্যার্; ম্যান প্রোপোজেস্, গড ডিস্‌পোজেস্। মুটবিহারীকে

কাল রাজি করিয়েছি; তা যা' স্ত্রৈণ, রাজি কি হ'তে চায়! তার এই চাঁদাটা নিন্ স্যার।"

সরমার জন্য আরোও ভালো দেখিয়া এবং বেশি করিয়া জিনিসপত্র লইতে হইল বলিয়া সকাল সকাল আর আসা হইয়া উঠিল না। নিকুঞ্জ যখন বাড়ি পৌঁছিল তখন রাত্ত দশটা।

প্রথমেই জেঠাইমার সহিত দেখা হইল। পায়ের ধূলা লইয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন আছ জেঠাইমা?"

"বেশ আছি বাবা, শুধু একটু কাসির মতো হয়েছে।"

মিথ্যা একটা রোগারোপ করিয়া নিকুঞ্জর মনটা পাপের ভয় একটু খুঁত খুঁত করিতেছিল; ভগবান কাশি ধরাইয়া মূলে কিছু সত্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিল, "ও কিছু নয়, ভেবো না, সেরে যাবে।···আর সব ভালো তো?"

"তা একরকম আছে সব। হ্যাঁরে, তুই চিঠি লিখলি আসবি না এ শনিবার।" একটু থামিয়া বলিলেন, "বউমার ঠাকুরমার শরীরটা খারাপ হয়েছিল বলে পাঠিয়েছিল। আজই সন্ধ্যের সময় যে পাঠিয়ে দিলাম তাকে।"

সংবাদটা এতই অপ্রত্যাশিত এবং তীব্র আশার মুখে এতই নিদারুণ যে চেষ্টা সত্ত্বেও নিকুঞ্জর মুখটা যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কিছু একটা বলা দরকার বলিয়া নিজেকে যথাসম্ভব সংবৃত করিয়া কহিল, "ভালোই করেছ।" একটু থামিয়া বলিল, "আমি বলছিলাম, দিন কতকের জন্যে ও ওখানে থাকলেই ভালো হ'ত, রোজ যাওয়া-আসা না করে;—বুড়ীকে দেখাশোনা করার সুবিধে হ'ত।"

স্বরটা শেষের দিকে বেশ গম্ভীর হইয়া আসিল।

তাহার পর জুতাজামা খুলিতে খুলিতে রাগটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, "আমি তোয়াক্কা কারুর করি না, আর কারুর টানেও আসি নি

আজ। আমার বলবার কথা শুধু, চালাকি করলে কেন আমার সঙ্গে? শুধু আমার সঙ্গে করলেও একটা কথা ছিল, জেঠাইমাকে ঠকাতে গেল কেন? গুরুজন—শুধু আমার গুরুজন নয়, বাবার গুরুজন, মার গুরুজন। নিজের পূজার্চনা নিয়ে রয়েছেন, দুনিয়ার মারপ্যাঁচ কিছু বোঝেন না; আর তাঁর কাছে কিনা স্বচ্ছন্দে ঠাকুরমার অসুখের নাম করে, মিথ্যে কথা বলে, জাল করে···"

জেঠাইমা আসিয়া বলিলেন, "চল্, দুটি খেয়ে নিবি চল্, বড্ড রাত করে এসেছিস এবার আবার।"

নিকুঞ্জ মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "এর মধ্যে কখন আবার রেঁধে ফেললে তুমি?"

"রাঁধতে হয়নি, বউমা খেয়ে যায় নি কি না···"

"খেয়ে যায় নি! তাই তার···"

বলিতে যাইতেছিল, "তাই তার উচ্ছিষ্ট আমায় খেতে হবে?"—রাগটা অনেক কষ্টে সংযত করিয়া বলিল, "কিন্তু আমি যে স্টেশনের দোকান থেকে খেয়ে এলাম জেঠাইমা; বড্ড রাত হয়ে গেল কিনা।"

"দেখ তো! বাড়িতে এলি তা ইস্টিশান থেকে খেয়ে এলি কেন?" খানিকক্ষণ গরগর করিয়া জেঠাইমা চলিয়া গেলেম। নিকুঞ্জ শয্যাগ্রহণ করিল। শরীরের যেখানটায় অন্ন থাকিতে পারিত সেখানটা পর্যন্ত যেন রাগে ঠাসা হইয়া রহিল। মাথার বালিশে সরমার চুলের গন্ধ. সেটা সরাইয়া ফেলিয়া পাশ-বালিশটা টানিয়া মাথায় দিল।

ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজিল—এগারোটা—সাড়ে—এগারোটা। মনটা ঘড়ির মন্থর কাঁটার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পায়ের দিকে সরমার চুলের গন্ধমাখা বালিশটা পড়িয়া আছে। একেবারে পায়ের কাছে ফেলিয়া রাখা কেমন যেন দেখায়, টানিয়া পাশে একটু দূরে রাখিল। সরমার দুষ্ট মাথাটিতে এতও কূটবুদ্ধি খেলে! ওর সাজা হওয়াই দরকার।

মাথার গন্ধে কিন্তু কেমন যেন নেশা ধরায়। অনেকদিন পূর্বে সরমা কবে একবার মাথার দিব্য দিয়াছিল, "যেখানেই থাকো, শনিবার অন্তত একবার আসতেই হবে, সাতটা দিনের পর এই একটি দিনের ভরসা।"···বারোটা বাজিতে কুড়ি মিনিট। শনিবার···সরমার শপথ দেওয়া শনিবার অস্তমিত হইতেছে। আর কিছু নয় তো কর্তব্য হিসাবেও কথা রাখা দরকার নয় কি ?···অন্যমনস্কভাবে পায়ের নিকট হইতে বালিশটা টানিয়া নিকুঞ্জ পাশে রাখিল। ঘড়িতে যখন পৌনে বারোটা হইয়াছে, তাহার হুঁস হইল বালিশটা কখন অত খেয়াল না করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়াছে।

নিকুঞ্জ বালিশটা সরাইয়া দিয়া উঠিয়া বসিল, কি ভাবিয়া আবার শুইল ; তাহার পর আবার উঠিয়া জেঠাইমার ঘরের সামনে গিয়া দুয়ারে আঘাত দিয়া ডাকিল, "জেঠাইমা, ও জেঠাইমা !"

নিদ্রা হইতে উঠিয়া জেঠাইমা ভীতভাবে তাড়াতাড়ি কপাট খুলিলেন। নিকুঞ্জ বলিল, "বুড়ির কি অসুখটা খুব বেশি ? আমার তো সেই থেকে ঘুম হচ্ছে না, যদি তেমন বাড়াবাড়ি হয়···"

"পোড়া কপাল, অসুখ কোথায় ? তুই আসবিনা শুনেছিল, তাই অসুখের ছুতো করে নাতনীকে নিয়ে যাওয়া। তুই ঘুমোগে।"

নিকুঞ্জ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ও ! আর আমি এদিকে ভেবে সারা হচ্ছি—যদি তেমন বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে···"

নিরাশ হইয়া আবার ফিরিল। নিজের ঘর পর্যন্ত আসিয়া চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইল। একটু পরে জেঠাইমার ঘরের কপাটে আবার করাঘাত হইল।

"জেঠাইমা !"

"কি রে ?"

"আমার সেই কথামালার গল্পটা মনে পড়ে গেল ; রোজ রোজ মিছিমিছি বলে, বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে,—লোকেদের বিশ্বাস চলে গেল ;

তারপর সত্যিই একদিন বাঘ এসে দিলে ঘাড়টা মটকে—সব শেষ। বিদ্যেসাগর মশায়ের উপদেশ, নেহাৎ ফেলেদেবার যুগ্যি নয় তো!…আমি ভাবছি, ধর যদি সত্যিই অসুখ করে থাকে, যদি বাড়াবাড়িই হয়; ধর যদি টেঁশেই যায় রাত্তিরে, তো চিরকালের মত একটা খোঁটা দেওয়ার কথা থেকে যাবে—নাতজামাই একবার এসে শেষ দেখাও দেখে গেল না!…"

জেঠাইমা যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন। একটু পরে বলিলেন, "তা বটে; তাহ'লে না হয় যাবি একবার?"

জেঠাইমার স্বরে কি একটু কৌতুকের আভাস পাওয়া গেল? নাঃ, সরলপ্রাণা বৃদ্ধা, নিজের পূজার্চনা লইয়াই আছেন, সংসারের মারপ্যাঁচ কি আর অত বোঝেন তিনি?

ভীমপলশ্রী

গান শুনিতে গিয়া কখনও এত নিগ্রহ ভোগ করি নাই।

আমাদের পাশের একটা শহরে সংগীত-প্রতিযোগিতা ছিল। নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছি। যখন নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলাম সেই সময় বেচারাম আমার পাশে ছিল। পত্রটা খুলিয়া পড়িতেছি, জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে শৈল?"

পত্রখানা খামে পুরিয়া বলিলাম, "ওরা একটা মিউজিক কম্পিটিশান্ করবে, তাই নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছে।"

আবার খবরের কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম, বেচারাম চুপ করিয়া বসিয়া পা দোলাইতে লাগিল। একটু পরে প্রশ্ন করিল, "একা, না সবান্ধবে?"

কথাটা যেন শুনিতে পাইলাম না, খবরের কাগজের উপর আরও ঝুঁকিয়া পড়িলাম; অবশ্য খবরের কাগজে একেবারেই মন নাই, মন আসলে তখন প্রমাদ গণিতেছে, বেচা যদি আবার ঘাড়ে চাপে তাহা হইলেই তো সর্বনাশ!

বেচা খবরের কাগজের নিচে হাত দিয়া খামটা টানিয়া লইল কতকটা যেন অবহেলার সঙ্গে চিঠিটা বাহির করিয়া পড়িয়া আবার রাখিয়া দিল। একটু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "কি রকম মনে হচ্ছে লড়াইয়ের ব্যাপারটা?—কে জিতবে?"

যেই জিতুক, আপাতত বেচারামই জিতিল। আর খবরের কাগজে অতি মনোযোগিতার ভান করা চলিল না, মুখটা তুলিয়া বলিতেই হইল, "যে-রকম দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে···"

বেচারাম বলিল, "সবাইকেই নেমন্তন্ন করেছে রে শৈল; ভাবছি, তোর যদি আপত্তি না থাকে তো যেতাম, অবশ্য আপত্তি থাকে তো থাক্।"

বলিলাম, "না, এতে আপত্তির কথা আর কি থাকতে পারে?"

স্টেজের উপর প্রতিযোগীদের স্থান হইয়াছে। একদিকটায় কয়েকজন বিচারক বসিয়া আছেন, প্রতিযোগীরা এক এক করিয়া আসিয়া গান করিতেছে। আমাদের যাইতে বেশ একটু দেরি হইয়া গেল, কেন না বেচারামকে ঠাঁই-নাড়া করা অল্প কথা নয়। যখন পৌঁছিলাম তখন বেশ একটু ভিড় হইয়া গিয়াছে; সামনের দিকে তো যেন চাপ বাঁধিয়া গিয়াছে। বেশ বড় অডিটোরিয়াম, আমাদের অনেক পিছনে, একেবারে শেষের দিকে, আসন গ্রহণ করিতে হইল।

বেচা বলিল, "যাক্, ভালো হ'ল, আগে বসলে কান ঝালাপালা করে তুলত। এমনি সওয়া যায় না, তার ওপর আবার কম্পিটিশান!"

পাশের একটি ভদ্রলোক এমন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিলেন যে, আমায় তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরাইয়া লইতে হইল,—পাছে টের পান যে গানের আসরে আসিয়া যে এমন অদ্ভুত রকমের মন্তব্য করে, সে আমারই একজন সঙ্গী।

গান ওদিকে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমার পাশের ভদ্রলোকটিকে প্রশ্ন করিলাম, "ক'জনের হয়েছে গান মশাই?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "সাত জনের হয়ে গেছে, শেষেরটি ছিল তেওয়ারী-জীর চেলা একটি বাঙালী ছোকরা, এমন···"

বেচারাম অঞ্জলিতে মুখ ঢাকিয়া বিড়ি ধরাইতেছিল, ঝুঁকিয়া আমার সামনে দিয়া ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল, "সাতটা গেছে, অনেকটা হাল্কা হয়েছে বলুন। আর ক-টা···"

আমি কথাটা চাপা দিবার জন্য ভদ্রলোককে প্রশ্ন করিলাম, "ছোকরা কি গাইলে?"

"যৎ-এ একটা দেশ ধরেছিল। হ্যাঁ, শিখেছে বটে মশাই; বলিহারি, কি কাজ গলার! কি চেকনাই!"

বলিলাম, "বড় আফশোস তো, দেরি হয়ে গেল; এ ছোকরাও মন্দ চালাচ্ছে না।"

"তার কাছে শিশু মশাই, সে গমক এখনও কানে লেগে রয়েছে!"

বেচারাম মুখ সরাইয়া লইয়া নির্বিকার ভাবে বিড়ি টানিতেছে দেখিয়া কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিলাম।

কথা বন্ধ করিয়াছি দেখিয়া বেচারাম কথা শুরু করিল, "এ ছোঁড়াটাও বুঝি ভালো গাইছে? গানটার নাম কি রে শৈল?"

মনোযোগের ভান করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

বেচারামের বিড়ি নিবিয়া গিয়াছিল, ধরাইয়া কাঠিটা নিচে ফেলিয়া দিয়া জুতা দিয়া ঘসিতে ঘসিতে বলিল, "এ বেটারা কার আমবাগানের দফা নিকেশ করেছে, লক্ষ্য করেছিস্?"

একটু বিরক্তির সহিতই বলিলাম, "এখানে আমবাগানের খবর কোথা থেকে পেলি তুই?"

বেচারাম কণ্ঠে ব্যঙ্গের আভাস মিশাইয়া বলিল, "এখানে বসে বসেই খবর পেয়েছি। হাঁ করে চীৎকার শোন্‌বার দিকে মন থাকলে পেতাম না।...স্টেজের মাথায় টাঙানো ওগুলো কি, চোখ মেলে দেখদিকিন?"

টাঙানো রহিয়াছে আমের পাতা আর বউল দিয়া রচিত একটা মালা, এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত টানা, মাঝে মাঝে জরি আর সোলার ফুলের দোলক। কি লক্ষ্য করিয়া যে বেচারামের মন্তব্যটা, বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু কথা বাড়িয়া যাইবে এই ভয়ে চুপ করিয়া রহিলাম।

কিন্তু আমি চুপ করিয়া থাকিলেই যে বেচারাম চুপ করিয়া থাকিবে এমন কোন কথা নাই; বিড়ির ছাই ঝাড়িয়া বলিল। "পাতা এক-আধটা তুললে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বেটারা বউলের ভুষ্টিনাশ..."

বলিলাম, "চুপ কর্ ! তা ভিন্ন ওগুলো মাঙ্গলিক।"

বেচারাম ক্ষেপিয়া উঠিল, বলিল, "মাঙ্গলিক ! আমার বাগান থেকে যদি কেউ ও-রকম মাঙ্গলিক পাড়তে যেত, তো তার ঠ্যাং দু'খানি সেইখানেই রেখে আসতে হ'ত, সদ্য সদ্য মঙ্গল ফলিয়ে দিতাম !···যদি ল্যাংড়ার বউল হয় তো খুব কম করে ধরলেও গেরস্তর গোটা পঞ্চাশেক টাকায় ঘা দিয়েছে। গেল বছর অমন ফসল হয়েছিল, তবু বিশ টাকার কম দর হয় নি, আর এবার যে রকম ফসলের অবস্থা, যদি চল্লিশ টাকার এক পয়সা কম···"

পাশের ভদ্রলোকটি হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "মশায়, শুনতে দিন দয়া করে একটু ; এই কি আপনার আমের হিসেব করবার সময় হ'ল ! অমন চমৎকার ঠুংরিটা ধরেছে···"

"ঠুংরিই শুনুন মশাই আপনারা" বলিয়া একটা বিষদৃষ্টি হানিয়া বেচারাম বাহিরে চলিয়া গেল। দুয়ারের কাছে গিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর আমায় প্রশ্ন করিল, "তুইও এখন বসে বসে ঠুংরি শুনবি নাকি রে ?"

'ঠুংরি' কথাটার উপর চাপ দিয়া এমন জোরে প্রশ্নটা করিল যে হলের প্রায় অর্ধেক লোক ঘুরিয়া প্রথমে বেচারামের পানে এবং পরে উহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া আমার পানে চাহিয়া দেখিল। আমি যেন এতটুকু হইয়া গিয়া নির্লিপ্তভাবে নাকের সোজা চাহিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলাম। কয়েকজন চটিয়া রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইতেছিল, বেচারাম ততক্ষণে সরিয়া পড়িয়াছে।

প্রায় আধ-ঘণ্টা তিন-কোয়ার্টার নিরুপদ্রবে শোনা গেল গান। কম্পিটিশানটা বেটাছেলে মেয়েছেলে মিশাইয়া ; বিচারের সময় কি ব্যবস্থা হইবে জানিনা, তবে বৈচিত্র্যের খাতিরেই হোক্ বা যে কারণেই হোক্, গান হইতেছে মেয়ে-পুরুষ মিশ্রিত করিয়া। ছেলেমেয়েদের সম্মিলনী,

বোধ হয় বিশ বছরের বেশি কেহ নাই। মেয়েরা বোধ হয় আরও অল্প বয়সের, সংখ্যায় খুব অল্প। পিছনের দিকে কাহারও হাতে প্রোগ্রাম নাই, বুঝা গেল না, তবে শুনিলাম উকিল-ব্যারিস্টারদের বাড়ির তিন চারিটি মেয়ে নাকি যোগদান করিবে।

বেশ তৃপ্তির সহিত ঠুংরিটা শোনা গেল। তাহার পর একটি মেয়ে আসিয়া আড়াঠেকায় একটি বাগেশ্রী ধরিল। গান শেষ হইয়া গেছে, করতালির পর মেয়েটি বিদায়ের পূর্বে শ্রোতৃবৃন্দকে নমস্কার করিতেছে, এমন সময় বেচারাম আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঁ হাতটা পাঞ্জাবির মধ্যে, মুঠোর মধ্যে করিয়া কি একটা লইয়া রহিয়াছে যেন। স্টেজের দিকে চাহিয়া একটু নৈরাশ্য এবং অনুতাপের সঙ্গে রাগতকণ্ঠে বলিল, "ডেকে নিলিনি কেন রে?"

অত্যন্ত রাগ হইল, গম্ভীরভাবে ওর মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কেন বল্‌তো?"

আমার ভাব দেখিয়া বেচা নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "না, তাই বলছিলাম অমনি, অমন গানটা হ'ল।

দুইটা গানের মাঝখানে একটু গোলমাল হয়। একটি ভদ্রলোক উঠিয়া প্রত্যেক গানের পূর্বে গায়ক আর গানের সামান্য একটু পরিচয় দিয়া দিতেছিলেন। মেয়েটি চলিয়া গেলে ভদ্রলোক উঠিয়া বলিলেন, "ওস্তাদ রহিম বক্সের সাক্‌রেদ শ্রীমান্ বিভাস গাঙ্গুলী—এবার মালকোষ..."

একে গোলমাল, তাহার উপর দাড়ি-গোঁফের প্রাচুর্যে—এবং বোধ হয় দুই চারিটি দাঁতেরও অভাববশত—ভদ্রলোকের কথা স্পষ্ট করিয়া শোনা যায় না, শেষের কথা কয়টি একেবারেই শোনা গেল না আবার। বেচারাম একটু আশ্চর্য হইয়া আমার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন রে শৈল?"

আমি বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলাম, "কি কেন?"

বেচারাম পাশের লোকটির পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া লইয়া আমার দিকে মাথাটা আরো বাড়াইয়া, গলা খাট করিয়া বলিল, "মালকোঁচা মারবে কেন ?"

বলিলাম, "মালকোঁচা নয়, মালকোষ—একটা রাগ, অর্থাৎ স্বর।"

একটু গলাটা চাপিয়া বলিলাম, "একটু চুপ কর্ তুই! কি ভাববে সব ?"

বেচারাম বলিল, "তাই বল্। আমি বলি—এর ওপর আবার মালকোঁচা আঁটে কেন ? একেই তো আমার সর্বদাই মনে হচ্ছে, তবলা-বাজিয়ের সঙ্গে এই বুঝি হ'ল হাতাহাতি।"

আমার সামনের, পিছনের, পাশের লোকেরা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে। ওদিকে চমৎকার তান উঠাইয়াছে ছোকরা। বলিলাম, "চুপ কর্।... তোর জামার মধ্যে কি রে ওটা, নড়ে যে !

বেচারাম বাঁ চোখটা খুব জোরে চাপিয়া আমায় থামিতে ইসারা করিল।

কিন্তু ঠিক সঙ্গে সঙ্গে জামার মধ্যে 'কুঁই-কুঁই-কুঁই-কুঁই' করিয়া একটা করুণ আর্তনাদ ওঠায় সংকেতে আর কাজ হইল না। একটু 'কিন্তু' হইয়া বেচারাম বলিল, "বরাতে কি করে ছিটকে এসে পড়েছে।" বলিয়া জামার ভিতর হইতে একটা হাড়-জিরজিরে কদাকার কুকুরের ছানা চেয়ারে নিজের পাশটাতে রাখিয়া বলিল, "গ্রে-হাউণ্ড, খাঁটি একেবারে। একটি রোঁয়া দেখা গায়ে, কেমন পারিস !"

অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। এক সঙ্গে কতকগুলা ভদ্রলোক মার-মুখো হইয়া উঠিল। বেচারাম কুকুরটার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া জামার মধ্যে লুকাইয়া লইল। একটু থামিয়া বলিল, "চল্ শৈলেন, কি যে শুনছিস হাঁ করে !"

ওদিকে খুব জমিয়া উঠিয়াছে। গান ক্রমাগত জলদে উঠিতেছে। সমের চারিদিকে তাল দ্রুত থেকে দ্রুততর হইয়া উঠিতেছে—একটা

তেহাইয়ের জন্য শ্রোতামাত্রেই প্রায় উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে—এমন সময় 'কাঁই-কাঁই-কাঁই' শব্দে সবাই চকিতহইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বেচারামকে কেন্দ্র করিয়া একটা কলরব উঠিল, "ফেলে আসুন মশাই!...আপনিও বেরিয়ে যান!...কি পাপ এসে ঢুকেছে, তখন থেকে শুধু...কোথাকার কাঠখোট্টা এসে জুটেছে! খালি আঁবের, তেঁতুলের দর!...সেটা গেল তো একটা কুকুর এনে হাজির করলে!...আর খালি গজর-গজর—বেরিয়ে যান মশাই!...না বেরুতে চায়, ভলন্টিয়ার দিয়ে..."

বেচারাম কুকুরটাকে নিচে ফেলিয়া দিয়াছিল, কুড়াইয়া লইয়া ক্ষিপ্ত জনতার মধ্য দিয়া কুণ্ঠা—এবং—দ্বিধাহীন পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

গান আবার একরকম শুরু থেকে আরম্ভ করিতে হইল ছোকরাকে। শেষ হইলে বেচারাম আবার ঠিক সেই রকম নির্বিকারভাবে প্রবেশ করিয়া দুয়ারের নিকট হইতে শিষ দিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিল, "তুই থাকবি, না যাবি শৈল?"

পরবর্তী গায়ক তখনও আসে নাই স্টেজে। আমি বলিলাম, "তুই যা।"

আশেপাশের সকলের বিদ্রূপ এবং আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বেচারাম আমার পাশে আসিয়া বসিল। বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে প্রশ্ন করিল, "শেষ পর্যন্ত থাকবি? তোরা মানুষ না কী রে!"

বলিলাম, "তুই বোস্ বাইরে গিয়ে, এক্ষুণি আসছি।',

বেচারাম চুপ করিয়া রহিল। একজন গায়ক স্টেজে প্রবেশ করিল, পরিচয়াদি দেওয়া হইলে সে তানপুরায় সুর দিল, সংগতের তবলায় ঘা পড়িল।

বেচারাম কামিজটা তুলিল বলিল, "দেখ্ শৈলেন!'

ঘুরিয়া দেখি পেটের কয়েক জায়গায় আঁচড়ানোর দাগ; অল্প অল্প রক্ত-

পড়িতেছে। ভীতভাবে বলিলাম, "শীগ্‌গির কোন ডিস্‌পেন্সারি চলে যা, টিংচার আইয়োডিন্‌ দিয়ে দে।"

তান উঠিল। বেচারাম বলিল, "শোন্‌ ওদিকে, এর পরে সব বলব'খন। কিন্তু এইটে শেষ।···ভয় নেই, আঠারো নখ, গুণে দেখেছি।"

চারিদিকের সেই কলরবের কথা স্মরণ করিয়াই হোক্‌ বা যে কারণেই হোক্‌ বেচারাম অনেকক্ষণ নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর এক সময় হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আসল জাতের, কখন সহ্য করে? চারিদিকে সবাই হন্যে হয়ে উঠছে দেখে মুখ চেপে ধরেছিলাম—আঁচড়ে পেটের দফা নিকেশ করে দিয়েছে। কখনও সইতে পারে? নেড়ী কুত্তোর ছানা নয় তো···"

বলিলাম, "শোন্‌, চুপ কর্‌।"

বোধ হয় আমার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া একটু পরে পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "দিব্যি গাইছে ছোকরা।"

ভদ্রলোক ওর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "বরাবর পঞ্চম ছুঁইয়ে যাচ্ছে—ভূপালীতে পঞ্চম!"

বেচারাম একটু অপ্রতিভ হইয়া সামনে চাহিয়া রহিল।

একটু পরে আমার দিকে ঝুঁকিয়া বলিল,"চল্‌ শৈল, কি আর শুনবি?—ভূপালীতে পঞ্চম ছোঁয়াচ্ছে···ওদিকে কুকুরটাকে কাপড়ের পাড়ে একটা থান ইঁটের সঙ্গে বেঁধে এসেছি;—কে চক্ষুদান দেবে—ওঠ্‌।"

অসম্ভব! বলিলাম, "চল্‌ উঠছি, এইটুকু হয়ে যাক্‌।"

অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর এ-গানটা তেমন জমে নাই, শেষের দিকে বেশ একটু গোলমাল হইতে লাগিল। বেচারামের নিকট হইতে একজন দেশলাইটা চাহিয়া লইয়াছিল, হাতে হাতে চালান হইয়া সেটা

একটু দূরে চলিয়া গিয়াছিল, আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, "যাচ্ছি বেচু, তুই আয়, বাইরে দাঁড়াচ্ছি।"

গানটা শেষ হইল। সেই ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া উঠিয়া আবার পরিচয় দিলেন। সবটা শোনা গেল না গোলমালে। শুধু অস্পষ্টভাবে কানে গেল, "......এইবার ভীমপলশ্রী গাইবেন।"

আমি প্রায় দুয়ারের কাছে আসিয়াছি; বেচারাম ডাক দিল "এইটে শুনে নে, তারপর..."

ফিরিয়া দেখি দেশলাইটা হাতে করিয়া বেচারাম দাঁড়াইয়া আছে, আমার দিকে কতকটা উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া। অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হইল। শুধু আমারই নয়, দেখি আশে-পাশের আরও কয়েকজন লোকের দৃষ্টি বেচার পানে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বেচারাম গান শুনিয়া যাইতে বলে!

আমি ফিরিলাম, ঠিক যে গানের টানে তাহা নয়, গান আর জমিতেছিল না। যতটা বুঝিতেছি, উদ্যোক্তরা একটা ভুল করিয়াছেন, ভাল ভাল প্রতিযোগীদের প্রথমেই গাওয়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন বোধ হয়। আমি ফিরিলাম এই জন্য যে, গররাজি হইলে বেচা ওইখানেই দাঁড়াইয়াই হাত-পা নাড়িয়া ডাকাডাকি করিয়া সভার মাঝখানে আবার একটা বেখাপ্পা ব্যাপার করিয়া তুলিবে।

ভীমপলশ্রীটা একেবারে জমিল না, অবশ্য জমিবে বলিয়া সবাই প্রত্যাশাও করে নাই; কারণ গাহিল আসিয়া একটি দশ-এগারো বৎসরের বালক। অধিকাংশ স্থলেই এই সব বালখিল্যদের আসরে নামানো হয় বিস্ময় উৎপাদন করিবার জন্য; উঁচু দরের গান যে হইবেই এমন আশা করাই ভুল।

কিন্তু আশ্চর্য, বেচারাম একেবারে মুখটি বন্ধ করিয়া নিশ্চল হইয়া রহিল; কেমন একটা স্তম্ভিত প্রতীক্ষমান ভাব, এক একবার নিজের ঠোঁটটা কামড়াইতেছে, এক একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেছে। একটা ধাঁধায় পড়িয়া

গিয়াছি, আড়চোখে চাহিয়া যতই দেখিতেছি সমস্যাটা ততই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। ব্যাপারখানা কি? বেচারাম এরকম উৎকট সমজদার হইয়া উঠিল!

গানটা থামিলে পূর্বের চেয়েও একটু বেশি গোলমাল হইতে লাগিল এবং তাহারই মাঝে সেই ভদ্রলোক উঠিয়া বলিলেন, "নিতান্তই বালক, গানটা রাখতে পারলে না—যদিও আরম্ভ যে চমৎকার করেছিল এটা আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন নিশ্চয়।...যা হোক্, আমাদের অনুরোধে এই সভায় যিনি সব চেয়ে মাননীয় অতিথি, তিনি স্বয়ং ভীমপলশ্রী আলাপ করে আমাদের চিত্ত বিনোদন করতে রাজি হয়েছেন। অবশ্য এই গানটা হবে প্রোগ্রামের বাইরে, সুতরাং যদি আপনারা অনুমতি করেন..."

চারিদিকে একটা সমর্থনের কলরব উঠিল। বেচারাম একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "নিয়ে আসুন তাঁকে, নিশ্চয়,—সসম্মানে নিয়ে আসুন।"

সকলে আবার বিমূঢ়ভাবে বেচারামের দিকে চাহিল, বেচা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমার দিকে ঘাড়টা নিচু করিয়া চাপা গলায় প্রশ্ন করিল, "অতিথির স্ত্রীলিঙ্গ কি রে শৈল?"

আবার কি নূতন পাগলামি! তাড়াতাড়ি বলিলাম, "অতিথিনী। তুই ওদিকে দেখ্।"

ভদ্রলোক "বলিতেছেন, নিয়ে আসতে হবে না, তিনি এখানেই আছেন, যদিও অনাড়ম্বর ভাবের জন্যে তাঁকে চেনা যায় না।"

কথাগুলা বলিয়া একদিকে বিনীত করজোড়ে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেই একটি বৃদ্ধ সামান্য একটু উঠিয়া অডিটোরিয়ামের দিকে চাহিয়া সকলকে অভিবাদন করিলেন এবং আসরের মাঝখানে আগাইয়া গেলেন। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি হইবে, মাথায় বেশ বড় বড় জুলফি, একটা আলখাল্লা পরা। ভদ্রলোক বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে পরিচয় আরম্ভ

করিলেন, "এখানে বোধ হয় খুব কম লোকই আছেন, যিনি খাঁ সাহেবের···"

হঠাৎ বেচারাম দাঁড়াইয়া উঠিল। রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। আমার বাম বাহুটা ধরিয়া বলিল, "ওঠ্, ওঠ্ বলছি, এখানে ভদ্দরলোকে গান শুনতে আসে!···ওই ওদের···?"

মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

অত্যন্ত রাগ হইল। ঝাঁকানি দিয়া হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম, "যা তুই—যেতে ইচ্ছে হয়, আমি যাব না। তখন থেকে পাগলের মতন··· আচ্ছা বেরসিক এক···"

"থাক্ ঐ দাড়ি-গোঁফের রস নিয়ে!—"বলিয়া বেচারাম কাহারও পা মাড়াইয়া, কাহাকেও প্রায় উল্টাইয়া দিয়া, কোথাও নিজেই টাল সামলাইয়া একটা উগ্র ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। দরজার বাহিরে কুকুর-বাঁধা কাপড়ের পাড়টাতে আটকাইয়া যাইতে এমন একটা কিক্ মারিল যে পাড় ছিঁড়িয়া কুকুরটা একেবারে রাস্তার ওধারে গিয়া পড়িল।

ওস্তাদ কালে খাঁর গান, শুনিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আর হইল না। উঠিতে হইল। অমন খিঁচড়ানো মন লইয়া গান শোনা চলে না।

এটা জংশন স্টেশান। আমাদের গাড়িটা এইখান হইতেই ছাড়ে। গিয়া দেখি, বেচারাম আমাদের গাড়ির জানালা দিয়া পা বাহির করিয়া দিয়া বিড়ি ফুঁকিতেছে। গাড়ি ছাড়িতে প্রায় এখনও ঘণ্টা দেড়েক দেরি, আর কেহই নাই গাড়িতে।

আমি আসিতে একবার দেখিয়া লইয়া বেচা আবার বিড়ি টানিতে আরম্ভ করিল। প্রশ্ন করিলাম, "চলে এলি যে অমন করে?"

বেচারাম ঘুরিয়া বসিয়া বলিল, "মেরে চলে আসি নি, এই ওদের বাবার ভাগ্যি। যত সব জোচ্চোর! ভদ্রলোকদের ডেকে বিদ্রূপ···"

আমি নিতান্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, "বিদ্রূপ কি রে! আমি তোর কথা তো কিছুই বুঝতে..."

বেচারাম বিড়িটা একটা ঝাঁকানি দিয়া ফেলিয়া দিল। গলাটা আমার দিকে বাড়াইয়া আনিয়া বলিল, "বিদ্রূপ নয়—নয় বিদ্রূপ? ঐ হ'ল ভীমপালের...'

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি; প্রশ্ন করিলাম, "ভীমপালের কি রে"—উত্তরের জন্য মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।.

বেচারাম ক্লাবটা যেদিকে সেইদিকে তর্জনী নির্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ ব্যাটা হ'ল ভীমপালের স্ত্রী! চাপ-দাড়ি, গায়ে আলখোল্লা। ভাবলাম, তবুও মেয়েছেলে যদি একজন গায়, এতটা পথ বেয়ে আসা, ওরই মধ্যে তবু একরকম সার্থক হবে।...বিদ্রূপ নয়? একবার হাজির করলে একটা ছোঁড়া—তার পরে একটা খাঁ সায়েব, এই করে ভাঁওতা দিয়ে সমস্ত রাত..."

এতক্ষণ পরে কথাটা পরিষ্কার হইল, কিছুমাত্র বিস্মিত হইলাম না।

শান্তকণ্ঠে বলিলাম, "ও বুঝেছি, থাক্ বেচু, যা হবার তা হয়ে গেছে।... একটা বিড়ি আছে? তাহ'লে দে।"

[বঙ্গশ্রী, কার্তিক ১৩৪৭]

মোতীর ফল

রাত্রি প্রায় এগারোটা। হারাণ চক্রবর্তী ক্রুদ্ধভাবে চটির আওয়াজ করিতে করিতে হন্ হন্ করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বাহিরের বারান্দায় বাল্যবন্ধু রমেশ গাঙ্গুলী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া রাগটা সপ্তমে চড়িয়া উঠিল। হাত নাড়িয়া বলিলেন, "নাও, এখন সামলাও! এই তোমায় বলে রাখছি রমেশ—কোন্‌দিন একটা অপঘাত হয়ে এরা আমায় ফাঁসি-কাঠে যদি না লটকায় তো···"

রমেশ গাঙ্গুলী বন্ধুর ধাৎ চেনেন, ধীরভাবে বলিলেন, "কি ব্যাপারটাই শুনি না আগে···"

"ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু!···ও নয় এক ফোঁটা একটা মেয়ে—না বুঝে বলেছে একটা কথা; কিন্তু তুই তো একটা জোয়ান মদ্দ—মেডিকেল কলেজে ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারে পড়্‌ছিস, বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে, আজ বাদে কাল রোজগার করতে বেরুবি—তুই কি বলে ওর কথায় গেলি নাচতে? যদি হাড়গোড় ভাঙা 'দ' হয়ে পড়তিস্···চুলোয় যাক্, ধর্ যদি রিষে তার লাঠিটা হাঁকড়েই বসতো?···

গাঙ্গুলী মশাই বলিলেন, "হয়েছে কি? ব্যাপারটা একটু ভেঙেই বল না···"

ভাঙিয়া বলিলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়।—

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এতগুলি কথা বলা হইল সে হারাণ চক্রবর্তীর ভাইপো পরেশনাথ। ছেলেটির বুদ্ধিশুদ্ধি কতটা হইয়াছে বলা যায়

না, তবে মেডিকেল কলেজের পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে একথা ঠিক। মাস পাঁচেক হইল বিবাহ হইয়াছে, সাত দিন হইল বধূ শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছে।

বধূটি সত্যই একটু ছেলেমানুষ; তাহার উপর বাড়ি অজ পাড়া-গাঁয়ে। যাহার নিজের ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারে পড়ার উপযোগী বয়স হইয়াছে এবং ফিফ্‌থ ইয়ার পর্যন্ত পড়ার জন্য নানারকম ভালোমন্দ অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহার মাত্র প্রায় পুতুল-খেলার উপযোগী বয়স আর অভিজ্ঞতার স্ত্রী হওয়া একটা সংকট অবস্থা। পরেশনাথ কি করিয়া যে নববধূর মন পাইবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এসেন্স্‌, পাউডার, রুজ, ফিতা, সাবান প্রভৃতিতে কয়েকটি বাক্স বোঝাই হইয়া গিয়াছে—মন যে ভেজে নাই এমন নয়—ছেলেমানুষ হইলেও মেয়েমানুষই তো?—কিন্তু স্বামীরা যে গূঢ় শক্তিতে বুঝিতে পারে সেই শক্তি দ্বারা পরেশনাথ বুঝিতেছে—কোথায় যেন কি একটা ফাঁক রহিয়া গেছে এখনও—যে জিনিসটির জন্য আরাধনা, বধূর কাছ থেকে ঠিক সেই জিনিসটি পাওয়া যাইতেছে না। বিপদ্‌ এই যে, জিনিসটা কি, সেটা সে নিজেও বুঝিতে পারিতেছে না, তবে একটা অভাব। বধূকে যে বলিবে, একটা নির্দিষ্ট কিছু বলিতে হইবে তো? তাহাকে সব রকম ভাবেই পাইতেছে, অথচ কোথায় একটু গলদ থাকিয়া যাইতেছে খুলিয়া বলা চাই তো?

একবার মনে হইল তাহার ভাষার অভাবে এই রকম অবস্থা দাঁড়াইয়াছে; বোধ হয় জানে কি অভাব, কিন্তু একটা সংজ্ঞা দিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছে না বলিয়াই এই আকুলি-বিকুলি।···মেডিকেল কলেজ,—শুধু চেরা-ফাঁড়া করিয়াই কাটাইল কিনা।

কিছু খুব আধুনিক নভেল আর কবিতার বই কিনিয়া পড়িয়া ফেলিল। যখন কিছু ভাব এবং ভাষা সংগ্রহ হইল, বধূকে ভাব ভাষা দিয়াই তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিল একটা রাত।

বলিল, "পলা (মেয়েটির নাম উৎপলা), তোমার মনের বেদনা হয়তো বুঝতে পারি, হয়তো পারি না, কিন্তু যদি নাই পারি বুঝতে তো তার জন্যে কি যে উদাসী ব্যথার বেদনে নিতুই তোমার ধ্যানে তোমার ধারণায় আনমনা হয়ে নিত্যিকার সব কাজ থেকেই আপনাকে আড়াল করে রেখে এই হাসি-কান্নার ধূপ-ছায়ার সুর দিয়ে গড়া সংসারের মধ্যে শুধু মনের বেদনাকেই ব্যথার সাথী করে হুতাশ হাওয়ায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে বেড়াতে বেড়াতে নিজের হারিয়ে যাওয়া মনকে পথ ভুলে যাওয়া পথিকের মত…"

কতকটা খেই হারাইয়া ফেলায় এবং কতকটা বধূকে টুস্‌কি দিয়া হাই তুলিতে দেখিয়া নিরাশ হইয়া থামিয়া গেল। বই যেগুলি কিনিয়া আনিয়াছিল তাহার প্রায় অর্ধেকগুলি পড়িতে এখনও বাকি আছে, তবু কিছু লোকসান সহিয়া ফিরাইয়া দিয়া আসিল।

এটা পঞ্চম দিনের ইতিহাস।

কিন্তু রোখ চাপিয়া গেল এবং আধুনিক ছাড়িয়া একেবারে পুরাতন পথ অবলম্বন করিল—বেশ একটু গ্রাম্যতা মিশাইয়া। রাত্রে বধূকে বলিল, "তোমার আমাকে পছন্দ হয়নি; যাকে ভালো লাগে।না তার চলন পর্যন্ত বাঁকা ঠেকে, তো তার দেওয়া এসেন্স সাবানে কি করবে?— বেশ, আমায় যদি মন্দই লাগে তো…"

বধূ একটু বিমূঢ়ভাবে ধীরে ধীরে বলিল, "মন্দ লাগে না তো…"

পরেশনাথের ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। ছয়টা দিনের এত সাধনা, এত তপস্যার পর স্ত্রীর কাছে এই পুরস্কার?—"মন্দ লাগে না তোমাকে!" যখন আশা করিয়া আছে যে মিলনের উন্মাদনায় ভাষা উচ্ছ্বাসে মুখর হইয়া উঠিয়া নিজের প্রকাশের দীনতায় মৌন হইয়া যাইবে—তখন শুধু ঐটুকু?—"মন্দ লাগে না তো!"…লোকে একটা ভাল তরকারি খাইয়াও যে এর চেয়ে বড় করিয়া প্রশংসা করে।…ভালো লাগা আর মন্দ

না-লাগার মধ্যেও যে কতটা তফাৎ সেটুকু বুঝিল না এই মূঢ়া বালিকা ?"
কি নিদারুণ অবস্থা !

পরেশনাথ মরিয়া হইয়া উঠিল, বলিল, "বেশ, আমার জন্মজন্মের পুণ্যফল যে আমায় তোমার মন্দ লাগে না···সত্যিই তো আমার মধ্যে ভালো লাগবার কি আছে ? আমি সুন্দরও নয়, কবিত্বও নেই আমার মধ্যে—মড়া নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি—আমায় লোকের ভালো লাগবে কি নিয়ে ?"

বধূ কতকটা কৌতূহলের সহিত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া শুনিতেছিল, স্বামীর বুকে একটু মুখটি লুকাইয়া বলিল, "বললাম তো ভালো লাগে···তুমি বড্ড অভিমানী !"

স্বামী যেন হাতে স্বর্গ পাইল, অন্তত স্বর্গের কাছাকাছি একটা কিছু। একেবারে মর্মের ক্ষুধা না মিটাইলেও, এতদিন পরে বধূ দুইটা কথা বলিল যাহাতে দাম্পত্যরসের একটু আভাষ আছে ; সেই দরদের একটু লেশ আছে, যাহার জন্য জন্মজন্ম সাধনা করা চলে।

বধূকে আদরে আরও টানিয়া লইয়া বলিল, "না, আমার তো অভিমান হ'তে নেই !···কি কষ্টে যে আমার দিন কাটছে তা আমি জানি আর অন্তর্য্যামীই জানেন···"

বোধ হয় মুখটা লুকানো আছে বলিয়াই বধূ বলিল, "আহা !—আমি যেন খুব ভালো আছি !"

পরেশনাথের নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস হইতেছিল না—এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত ! স্বপ্ন না সত্য ?

ব্যাকুলভাবে বধূকে আরও কাছে টানিয়া পরেশনাথ বলিল, "কেন পলা ? আমি ভালো না থাকলে তুমিও ভালো থাকবে না কেন ? আমি তোমায় চিরদিন বুকে করে আগলে থাকব, পলা ; সংসারের সব ঝঞ্ঝা, সব আঘাত আমার ওপর দিয়ে যাবে, তোমার গায়ে তো আমি একটু আঁচড় লাগতে দেব না। তোমার মুখের হাসিটি বজায় রাখাই তো

আমার জীবনের সব চেয়ে বড় ব্রত। আমি তার জন্যে সব সইব পলা, আমার মুখে কষ্টের ছায়া দেখলে যদি তোমার মুখের হাসিটি মিলিয়ে যায় তো সব কষ্ট আমি হাসিমুখেই সইব পলা। শুধু একটি জিনিস আমি সইতে পারব না।—তুমি মুখ ভার করে থেক না; এ মুখখানি অন্ধকার দেখলে আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখি যে!—আমি বেশ বুঝছি তোমার একটা কিছু অভাব হয়েছে—এখানে আর কাউকে বলা বোধ হয় চলবে না; কিন্তু আমাকেও বলছ না—কী যে হচ্ছে আমার মনে, কী করে যে দিন কাটছে আমার!…"

"বড্ড গরম হচ্ছে"…বলিয়া বধূ মুখটা বাহির করিয়া লইল। একটু চুপ করিয়া রহিল দু'জনে। তাহার পর পরেশনাথ বধূর পিঠে হাত দিয়া বলিল, "বলো আমায় পলা, কী চাও তুমি; কি করতে বলো আমায় তোমার জন্যে? বলো পলা,—তোমার সেবা করবার জন্যে আমি ঝুরে মরছি, অথচ…"

বধূ নিরুত্তর। চরমে আসিয়া পরেশনাথ আর হাল ছাড়িল না। বধূর হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আছে কোন একটা কথা, আমায় বলতেই হবে পলা, আমার দিব্যি রইল, বলো, আমার মাথা খাও…"

বধূ মুখটা গুঁজিয়া একটু রাগিয়াই বলিল, "অমনি দিব্যি দেওয়া হ'ল… সে তুমি পারবে না।"

পরেশনাথ হাতটা আরও চাপিয়া ধরিল, বলিল, "নিশ্চয় পারব পলা, বলে দেখ বরং; তোমার জন্যে আমি কি না করতে পারি?"

বধূ আরও গুটিসুটি মারিয়া চুপ করিয়া রহিল এবং আবার তাগাদা হইলে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া উল্টা দিকে মুখ করিয়া শুইল। স্বামী আগাইয়া গিয়া কনুইয়ের উপর ভর করিয়া প্রশ্ন করিল, "বলবেনা? দিব্যি দিলাম, তবুও? বেশ?"

বধূ দুই হাতে মুখটা ঢাকিয়া বলিল, "খিড়কির দোরের কাছে যা আছে..."

পরেশনাথ প্রথমটা বিস্ময়ে একেবারে সোজা হইয়া বসিল—এ ধরণের কথা সে একেবারেই প্রত্যাশা করে নাই। মনে মনে খিড়কির দোরের কাছাকাছি সমস্তটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিল। খিড়কির পুকুর তাহার পাশে একটা ছাইগাদা আর পাঁচমেশালি কতকগুলা গাছের জঙ্গল ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইল না। ছোট একটা টিনের চালার মধ্যে একটা ভেড়া বাঁধা থাকে, কাকার শখ; বধূ কি ইঙ্গিতে একটা বিদ্রূপ করিল? তা যদি করিয়া থাকে সেটাও তো একটা মস্ত লাভ!

বলিল, "একটা ভেড়া বাঁধা আছে, পলা; তা তোমার যদি ইচ্ছা হয় তুমিও একটা পুষতে পার। ধরা তো দিয়েই আছে।"—একটু হাসিল।

বধূ অবশ্য ঠাট্টা বুঝিল না। সেই ভাবেই একটু যেন অধৈর্য হইয়া বলিল, "আহা একটা যেন বিলিতি আমড়ার গাছ নেই!...তুমি একটু সরো বাপু, খালি ঘেঁসে আসছ।"

আছে একটা ঝাঁকড়া-ঝোঁকড়া গোছের আমড়া গাছ। পরেশনাথ একটু বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিল, "কিছু দেখেছ সেখানে? ভয় করে?"

বধূ মুখ গুঁজিয়াই বলিল, "তাতে আমড়া পাকেনি যেন?...সরো তুমি, গরম হচ্ছে।" পরেশনাথের যেন ধড়ে প্রাণ আসিল এতদিন পরে। হাসিয়া বলিল, "ও! তাই খেতে সাধ হয়েছে! বলতে হয়,—বেশ, পাড়িয়ে দেবো কাল।"

বধূ ভীতভাবে বলিয়া উঠিল, "না, না, দিব্যি রইল আমার। আমার যেন লজ্জা করে না!"

এতদূর অগ্রসর হইয়া আর এক সমস্যা; পাড়িবার ব্যবস্থা করিলে লজ্জা, যদি না করা যায় তো সামান্য দুইটি আমড়ার জন্য একটা অতৃপ্তির বেদনা।

পরেশনাথ মনে মনে সমস্যার একটা কূল পাইবার চেষ্টা করিতেছিল, বধূ বলিল, "কেউ যদি এরকম অন্ধকার রাত্তিরে চুপি চুপি গিয়ে…"

পরেশনাথ যেন অন্ধকারে একটু আলো দেখিতে পাইল। বধূকে বেষ্টন করিয়া বলিল, "আমি যাই পলা ?"

বধূ বলিয়া উঠিল, "না, না, আমি তাই বললাম নাকি ?"

সামান্য একটু চুপ দিয়া বলিল, "আর যদি পিছলে, কি গাছের ডালটাল ভেঙে পড়ে যাও—তখন ?"

পরেশনাথের মনের তখন এমন অবস্থা যে সামান্য হাত-পা'র উপর আর মমতা নাই। বলিল, "তোমার জন্যে না হয় লাগলোই একটু আঘাত, পলা। শোননি ছেলেবেলায়—কেশবতী কন্যার জন্যে রাজকুমার সোনার গাছ থেকে মোতীর ফল নিয়ে আসতে কি নাকালটাই না সহ্য করত ? সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে, কত বিপদ কাটিয়ে…আমার কেশবতীর যদি হয়েছেই একটা সাধ…"

বধূ বলিল, "না, কাজ নেই ; আমার ভয় করে বাপু !"

পরেশনাথ তাহাকে আর একবার আদর করিয়া বলিল, "কিছু ভয় নেই তোমার, পলা। তা ভিন্ন গাছে ওঠবার দরকারও হবে না ; পাঁচিলে উঠলেই চলবে, অনেক ডাল এসে পড়েছে।"

মুখটা নামাইয়া বলিল, "আমড়া পেলে আমার সঙ্গে খুব ভাব হবে তো ?"

বধূর ভয়টা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল, বলিল, "না বাপু, আমার সত্যি বড্ড ভয় করছে, পড়ে যেয়ো না যেন।…দাঁড়াও, আমার বাক্সয় মা ঠাকুরের ফুল দিয়ে দিয়েছিলেন—খুঁটে বেঁধে দিই।"

অক্ষয় কবচ ধারণ করিতে করিতে পরেশনাথ বলিল, "এ কিন্তু সেই পয়সায় দশটা আমড়া নয় ; এর এক একটার দাম অনেক, তা বলে দিচ্ছি।"

বধূ একটু হাসিয়া বলিল, "তা দোব'খন, আমার মুখ-দেখানি টাকা আছে।"

পরেশনাথ হাসিয়া বলিল, "ঐ দাম নাকি ?"

তাহার পর যে দামের কথা বলিয়াছিল তাহার কিছু আগাম লইয়া ধীরে ধীরে কবাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পাঁচিলে উঠিয়া কাজ হইল না ; ডাল আছে, কিন্তু আমড়া নাই,—বধূর খালি একলার রসনা নয় তো! গাছে উঠিতে হইল। জানা গাছ, অবশ্য অজানা হইলেও কিছু ইতর বিশেষ হইত না—তবে কতকটা সুবিধা হইল।

আমড়ার থোলো ধরা গেল একটা, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন্‌টে পাকা, কোন্‌টে ডাঁসা, কোন্‌টে কাঁচা ঠিক বোঝা যাইতেছে না। কোমর বাঁধিয়া একটা কোঁচড়ের মতো করিয়া রাখিয়াছিল, সমস্ত থোলোটা তুলিয়া তাহার মধ্যে সংগ্রহ করিল। আর একটু উঠিয়া আরও কতকগুলা তুলিল, এমন সময় ভিতরকার ভারে ও চাপে কোঁচড়ের খুঁট দুইটা আল্‌গা হইয়া গিয়া সমস্ত আমড়া একেবারে নিচে···

ঠিক নিচে বলিলেও ভুল বলা হইবে, ভেড়ার কুঠুরির টিনের ছাদের উপর। চড়চড় চড়চড় করিয়া সহসা একটা উৎকট আওয়াজ হইয়া বাড়ির সবাইকে জাগাইয়া দিল। ভেড়ার আর্তনাদ এই কার্যে সহায়তা করিল।

হারাণ চক্রবর্তী হাঁক দিলেন, "কিসের শব্দ! রিযে, দেখ্‌তো কিসের শব্দ হ'ল।"

হৃষীকেশ বাড়ির চাকর, বলিল, "আমড়া পড়ল, কর্তামশাই!"

"অত আমড়া—হঠাৎ কোথাও কিছু নেই!···তুই একবার ঘুরে দেখে আয়।"

সমস্ত দিনের পর খাটিয়া-খুটিয়া হৃষীকেশ এই সময়টা একটু মৌতাতে থাকে ; না উঠিয়া একটু পরে ঢুলিতে ঢুলিতে বলিল, "দেখে এলাম চারিদিক

ঘুরে, আমড়াই কর্তাঠাকুর। হনুমানে ফেলেছে নিশ্চয়; আম মনে করে, তারপর টক্ আমড়া দেখে—রেগে ঐ করে…”

একটি বয়স্থা নারীকণ্ঠের আওয়াজ হইল, “তুমি উঠে একটু তাড়া দাও রিষু। এবারে তেঁতুল পাওয়া গেল না, ঐ আমড়া ক’টি ভরসা, শুনছ?”

বধূ দারুণ উৎকণ্ঠায় নিজের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পরেশনাথ তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া একটা মাঝারি গোছের ডাল কড়কড় করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কাপড়টাও ছিঁড়িয়া গিয়া খানিকটা ঝল্‌ঝল্ করিয়া ঝুলিতে লাগিল। তাগাদা হইল, “রিষে! উঠ্‌লি?”

হৃষিকেশকে উঠিতে হইল, কিন্তু আমড়াতলায় আসিয়া তাহার মৌতাত ছুটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।…ল্যাজ ঝুলিতেছে; হনুমানই বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন কাপড়-পরা!…কাপড়-পরা হনুমান!—মাথায় যতটুকু শক্তি ছিল তাই দিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর নেশাটা হঠাৎ ছুটিয়া গেল, ডাকিল, “কে?”

সঙ্গে সঙ্গেই ডাকিল, “কর্তাবাবু; শীগ্‌গির আসুন, কোন্ সুমুন্দি দেয়াল টপকে পড়বে বলে গাছে উঠেছে! দাদাঠাকুর, অ দাদাঠাকুর! …নশীরাম, জেগে আছ হে? একবার স্বরূপ বাগ্দীকে হাঁক দাও। শীগ্‌গির এস…ততক্ষণ স্যাঙাৎকে আমড়া খাওয়াচ্ছি!”

এক মুহূর্তের মধ্যেই বাড়িটাতে একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল।

হারাণ চক্রবর্তী ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ও খড়ম খট খট করিতে করিতে ছুটিয়া আসিলেন।

পরেশনাথের দাদা অপরেশ একটা গুপ্তী লইয়া উপস্থিত হইল।… মেয়েদের শঙ্কিত কলরবে, ছেলেদের ভীত কান্নায় বাড়িটা একেবারে জাগিয়া উঠিল। কলাবাগানের ওদিক থেকে নশীরাম ডাকিল, “কি খবর গো

রিষি! হৃষীকেশ বলিল, "খবর খুব খারাপ নয়, আগলে রেখেছি আমরা, তুমি এস একবার শড়কিটা নিয়ে···একটা হাঁক দিলে স্বরূপ বাগ্দীকে?"

পরেশের দাদা বলিল, "কে উঠেছিস নেমে আয়! নেমে আয়, নাহ'লে ছুঁড়লাম এই হাতের গুপ্তী···"

হারাণ চক্রবর্তী একটু ভীতু প্রকৃতির লোক, একটু দূরেই ছিলেন, বলিলেন, "পরেশ ওপরতলা থেকে নামে না কেন? তার কাছে তো রিভলভারটা রয়েছে···অ, পরেশ!"

পরেশ তখন গাছ থেকে নামিতেছে; ওপরতলা থেকে নামিবে কি করিয়া? ছেঁড়া কাপড়ের লাঙ্গুলটি ঝুলাইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া মাটি স্পর্শ করিল এবং ঘাড় নিচু করিয়া গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

"ঃই!"

"পরেশ নাকি? গাছে!"

হৃষীকেশ বলিল, "তাও রাত দুপুরে! কি কাণ্ডটা হ'ত এখুনি!"

কলাবাগানের ওধার থেকে নশীরাম প্রশ্ন করিল, "সব যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে রিষি? আমি যাচ্ছি যে গেঁথে নামাবার জন্যে···"

হারাণ চক্রবর্তী উত্তর দিলেন, বলিলেন, "আসতে হবে না নশু, আমাদের পরেশ বাবুর শখ···"

এমন সময় গিন্নী উপর থেকে হস্তমস্ত হইয়া নামিয়া আসিলেন। হারাণ চক্রবর্তীর কাছে গিয়া একটা চাপা ভর্ৎসনার সহিত হাত নাড়িয়া বলিলেন, "আর ঘরের কেচ্ছা বাইরের লোকের কাছে শোনাতে হবে না রাত দুপুরে! ঐ শুনবে চলো পাগলের মতো—'না, আর আমড়া খাবো না—না, আমড়া খাবো না'—বলতে বলতে বউটা বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়ল এতক্ষণ···রিষে, নশু ওদের বলে দে একটা হনুমান ছিল—এমন কিছু মিথ্যেও বলা হবে না।···মরি!—দেখতে আর কিছু বাকি রইল না!"

[যুগান্তর, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৮]

খাদ্য-বিজ্ঞান

তর্কের চোটে আগুন ছুটিয়াছে, এমন সময় রামজয় খুড়ো ঠুকঠুক করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ললিত মাস্টার বলিল, "তোরা এবার থাম্ বাপু, খুড়ো এসে গেছেন, মীমাংসা করে দেবেন।"

একজন তাড়াতাড়ি গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটা চেয়ার আনিয়া দিল। লাঠিটা চেয়ারের পিঠে আটকাইয়া দিয়া বসিতে বসিতে খুড়ো প্রশ্ন করিলেন, "কথাটা কি ?···তামাক আনতে বলে দে শিবকালী।"

শিবু বলিল, "সে বলতে হবে না, তোমায় আসতে দেখেই বলে পাঠিয়েছি।···কথাটা কিছু নয়, খাবারের সঙ্গে মনের কিছু সম্বন্ধ আছে কি না, মানুষের মেজাজটা তার আহারের অনুযায়ী হয় কি না—মানুষই হোক্ বা ইতর জীবই হোক্, যেমন ধর···"

খুড়ো বলিলেন, "হয়, আবার হয়ও না, যেমন···"

গোবিন্দ বলিল, "ও রকম দু-তরফা রায় দিও না খুড়ো, ওইটি তোমার কেমন একটা রোগ।"

খুড়ো বলিলেন, "হয় না এই জন্যে বলছিলাম, তোরা যেমন লাগিয়েছিস্ দেখলাম, তাতে মনে হয় সবাই এক-একটা বুনো মোষ জলখাবার করে এসেছিস্, কিন্তু তা তো করিস নি! হয় এইজন্যে বলছিলাম, যত দিন দাঁত ছিল, পাঁঠাটা-আসটা খেতাম, হাঁকডাক ছিল, সবাই তাঁবেতে থাকত। এখন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ধরেছে, মুগের ডাল বরাদ্দ, তোদের খুড়ীর নাকঝামটার কাছে দাঁড়াতে না পেরে গুটি গুটি সরে পড়তে হ'ল।"

ললিত মাস্টার বলিল, "ওদিকে খুড়ী আবার তোমার ভাগেরটাও টানছে কিনা..."

ছেলের দল একটু মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

তামাক আসিল। খুড়ো হুঁকাটা একবার টানিয়া দেখিলেন, জল খানিকটা ফেলিয়া দিয়া আবার কলিকাটি সযত্নে বসাইয়া দুইটা টান দিয়া বলিলেন, "খাবারের সঙ্গে মেজাজের সম্বন্ধ আছে বইকি, কে বলছিল নেই?"

শিবু বলিল, "আমি বলছিলাম। বেশ, তা হ'লে দুর্বাসা মুনি কি খেতেন বলো?"

গোবিন্দ বলিল, "ফল খেতেন।" তাহার পর হাত নাড়িয়া মুখটা একটু বিকৃত করিয়া বলিল, "কিন্তু আজকালকার তোমা হেন সৌখীন বাবুদের মতো ফলের আসল জিনিসটুকু বাদ দিয়ে শুধু নরম শাঁসটুকুই খেতেন না। যেটা খেতেন, সেটার মধ্যে ভাইটামিন্‌টুকু ষোল আনা বজায় থাকত। বাজে ব'কো না।"

শিবু আর তাহার তরফের দুই-একজন 'রেখে দে তোর ভাইটামিন্‌'—বলিয়া উগ্রতরভাবে আরম্ভ করিতে যাইতেছিল। খুড়ো বলিলেন, "তোরা থাম্‌, দেবতা-ঋষিদের আর এসব আসরে টেনে এনে কাজ নেই। কি খেলে ওঁদের ওপর কি রকম প্রভাব হ'ত, আমাদের মাথায় ঢুকবে না।...রমা তাঁতীকে দেখেছিস তো, সন্ধ্যের সময় ছটাকখানেক ধেনো চড়িয়ে এসে কি কাণ্ডটাই করে চোপর রাত!...দেবতারা অষ্টপ্রহর অমৃত গিলছেন, বেদই বলো, রামায়ণই বল, মহাভারতই বল, কোনখানে কাউকে একটা বেফাঁস বলতে দেখেছিস?...ওঁদের ছেড়ে দিয়ে যাদের বুঝব তাদের কথা ধরা যাক্‌। আহারের সঙ্গে শরীরের মনের আছে সম্বন্ধ; আজকালকার সায়েন্সও বলছে, আগেকার ইতিহাস-কিংবদন্তীও বলছে।...বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার কথা জানিস্‌ সব?"

শিবু গোঁজ হইয়া বসিয়া ছিল, বলিল, "না, বাঙালীর ছেলে—কপালকুণ্ডলার কথা জেনে লাভ কি?"

খুড়ো বলিলেন, "গুমোরের কথা নয়, কপালকুণ্ডলার তাবৎ ঘটনা কেউ জানে না। জানত এক বঙ্কিম, আর জানতো বঙ্কিম যার কাছে শুনেছিল সে। বঙ্কিমও নেই, সেও নেই; এখন আর কেউ জানে না।"

শিবু মুখটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি জান নাকি?"

খুড়ো বলিলেন, "আমার জানা ছোট্‌ঠাকুদ্দার কাছে। তিনি অবশ্য খোদ সেই লোকের কাছে শুনেছিলেন, যে বঙ্কিমকে বলে। আমি এতদিন আমল দিই নি কথাটায়, ছোটদাদু বললে তো বললে, শুনে গেলাম। তারপর এই সেদিন কোথায় একটা কার চিঠিতেই হোক্ বা কোন বইয়েই হোক্, দেখলাম, বঙ্কিমের যখন মেদিনীপুরে পোস্টিং সেই সময় একজনের মুখে এক কাপালিকের গল্প সে শোনে, তাই থেকেই কপালকুণ্ডলার জন্ম। তখন মনে হ'ল, তবে তো ছোটদাদু কিছু খেলাপ বলে নি।"

গোবিন্দ বলিল, "তা বঙ্কিম কপালকুণ্ডলা লিখলে তো ওটুকু বাদ দিলে কেন? তুমি ঠিক একটি আজগুবি কিছু ছাড়বার যোগাড় করছ খুড়ো।"

খুড়ো বলিলেন, "যা পেয়েছিল, তার মধ্যে থেকে যেটুকু তার উপন্যাসের জন্য দরকার, সেটুকু নিয়ে বাকিটুকু বাতিল করে দিয়েছিল, রসিক লোক তো! গাছে আমায় পাকা আমটি দিলে, তাই বলে আমায় নির্বিচারে আঁশ, আঁটি, খোসা সব পেটে পুরতে হবে?"

শিবু গোবিন্দের পানে কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "ভাইটামিন্ আছে বলে?"

গোবিন্দ মুখটা গোঁজ করিয়া লইল, খুড়ো তামাক টানিতে লাগিলেন। ললিত মাস্টার বলিল, "তা তোমার কপালকুণ্ডলার সেই অলিখিত অধ্যায়টা কি বলোই না হয়, তুমি যে আবার দর বাড়াতে আরম্ভ করলে খুড়ো!"

খুড়ো বলিলেন, "সবই ওরা আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে চায় বলে খেলো হতে মন চায় না।...অধ্যায়-টধ্যায় নয়, ওই যে বললাম, কপালকুণ্ডলার

আসল ব্যাপারের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই, বঙ্কিমও তাই সে কথা তোলে নি। খাবারের সঙ্গে মনের সম্পর্কের কথাটা উঠল বলে আমার মনে পড়ে গেল পুরণো কথাটা, এ নিয়মের অত ভাল উদাহরণের কথা আমার আর জানা নেই কিনা।"

খুড়ো হুঁকাটায় আবার তুইটা টান দিলেন, তাহার পর আরম্ভ করিলেন,—"যে সময় কাপালিক-নবকুমারের দেখা হয়, কাপালিকের মনের অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ। তার আশ্রমে ভয়ানক একটা অনাচার ঢুকেছে, কাপালিক টের পেয়েছে এর ফল ভালো নয়; তার এত দিনের সাধনা ঠিক যখন সিদ্ধির মুখে, বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল। তার মনের অবস্থা ঠিক পাগলের মতো। কিসে দোষটা কাটিয়ে উঠবে, তাড়াতাড়ি সেই ফিকিরে সে ছুটোছুটি করছে, এমন সময় নবকুমার এসে পড়লো হাতের কাছে। কাপালিক ভাবলে, যাক, বোধ হয় দেবী সদয় হলেন, যা খুঁজছিলাম পাওয়া গেল বোধ হয়। নবকুমারকে প্রশ্ন করলে, 'কস্তম্ জাত্যা? শাক্ত বৈষ্ণবো বা?'—অর্থাৎ তুমি জাতিতে শাক্ত না বৈষ্ণব? নবকুমার উত্তর করলে, 'শাক্তোঽহম্।' তখন আদেশ হ'ল, 'অনুগচ্ছস্ব, অর্থাৎ পেছনে পেছনে এস।' না যদি নবকুমার বলে কথাটা, অত কাণ্ড হয় না। গেরো আর কাকে বলে! দেখলে, লোকটা রক্তাম্বর-পরা কাপালিক; ভাবলে, শাক্ত কি আর শাক্তের অনিষ্ট করবে? এই পরিচয় দিই।...ভেতরে যে এদিকে কি কাণ্ড হয়েছে, কাপালিক যে একটা আঁটো-সাঁটো নধরকান্তি শাক্তই খুঁজে বেড়াচ্ছে, তা তো আর জানত না বেচারী। বললে 'শাক্তোঽহম্।... 'অনুগচ্ছস্ব',...'বেশ, চলো।"

শিবু বলিল, "কপালকুণ্ডলায় তো এ ধরণের কথাবার্তা নেই খুড়ো।"

খুড়ো উত্তর করিলেন, "কিন্তু হয়েছিল এই ধরণেরই কথাবার্তা। সবটা শোন, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।...নবকুমার পেছনে পেছনে এসে দেখলে,

যা ভেবেছিল তাই বটে, শ্মশানকালীর বেদী, পূজোর চারিদিকে বীরোপচার, আসনের পাশেই কারণপূর্ণ নরকপাল, সবই যা ভেবেছিল। তবে একটা ব্যাপার দেখে সে একেবারে হকচকিয়ে গেল, দেখলে, আসন থেকে অল্প একটু দূরে এক প্রায় বারো-তেরো হাতের বাঘ। কাপালিক বুঝেছিল, ভয় পেয়ে যাবে; বললে, 'নিঃশঙ্কো অনুসরস্ব।' প্রথমটা ভয়ই পেয়েছিল—তুমিও পেতে, আমিও পেতাম, কিন্তু একটু কাছে আসতে ভয় গিয়ে তার জায়গায় ভয়ানক আশ্চর্য ভাব এসে পড়ল নবকুমারের মনে;—বাঘই—জলজ্যান্ত, তেরো হাতের একটি চুল কম নয়; কিন্তু এ কি! সে চাউনিই বা কোথায়? সে গোঁফ-ফোলানই বা কোথায়? সে গর্জনই বা কোথায়? কাপালিক আসতে একবার চোখ তুলে চাইলে—সে চাউনি হরিণের চোখকেও হার মানায়; কুঁইকুঁই করে দুবার আওয়াজ করলে—যেন কুকুরবাচ্চা মাই খাবার জন্যে ধাড়ীর কাছে আবদার ধরেছে। তারপর আরও দু' পা এগুতে যা দেখলে, তাতে তার যাও একটু বুদ্ধি ছিল লোপ পাবার দাখিল হ'ল। দেখলে, বাঘের মুখটি থাবার ওপর রাখা আর একটি থাবায় একটা বেশ মোটা তুলসীকাঠের মালা জড়ানো।"

সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "খুড়ো!" ললিত মাস্টার বলিল, "আজকালকার কচি ছেলের কাছেও এমন গাঁজাখুরি বের করা চলে না খুড়ো।"

খুড়ো বলিলেন, "তা হ'লে থাক, করব না বের। একটু কাজও আছে আবার দরকারী।"—বলিয়া লাঠিটা লইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেই শিবু লাঠিটা ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "চা করতে বলেছি খুড়ো, তোমার নাম করা চা খেয়ে কে পাপের ভাগী হবে বলো?

খুড়ো বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতে লাগিলেন। আগ্রহে সবাই মরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কচি ছেলেরও অধম হইবার ভয়ে কেহ আর সেটা প্রকাশ করিবার সাহস করিতেছে না। অবশেষে গোবিন্দ

বলিল, "গাঁজাখুরি-টাঁজাখুরি বুঝি না, আমার আবার আধকপালে রোগ আছে, শেষ করো খুড়ো, যখন ফেঁদেছ; ওষুধ-গেলা করেও আমায় শুনতে হবে।"

শিবু বলিল, "না খুড়ো, তুমি বলো আমি মন্ত্রশক্তি বিশ্বাস করি, তা ছাড়া মন্ত্রশক্তি না থাক্, উইল্-পাওয়ার্ আছে, হিপ্‌নটিজ্‌ম্ আছে, মেস্‌মেরিজ্‌ম্ আছে ..."

অপর কে একজন বলিল, "আর এ তো অ্যাফ্রিকার সোমালিল্যাণ্ডের জঙ্গলের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে ভারতের এক তপোবনের কথা—কাপালিকেরই হোক্ বা বৈষ্ণবেরই হোক্, তাতে যায় আসে না।"

শিবু একটু অধৈর্যভাবে খুড়োকে আগাইয়া দিল, "দেখলে, থাবায় একটা মোটা তুলসী-কাঠের মালা জড়ানো। তারপরে? গিয়ে নিশ্চয় থাবা ছুঁয়ে একটা প্রণাম করলে?"

চা আসিল। যে আনিয়াছিল তাহারই হাতে হুঁকাটা দিয়া খুড়া চা-টা শেষ করিলেন, তাহার পর আবার গোঁফজোড়াটা মুছিয়া হুঁকাটি লইয়া বলিলেন, "অথচ একটা দিন আগে পৌঁছুলে নবকুমার বাঘের চেহারা দেখতো বিলকুল অন্য রকম। গর্জনের চোটে আশ্রমের ত্রিসীমানার মধ্যে আসে কার সাধ্যি! অষ্টপ্রহর দৌড়োদৌড়ি লাফালাফি : এক্ষুনি এ জানোয়ারটাকে তাড়া করে নিয়ে গেল তো, একটু পরেই একটা অন্য জানোয়ার মেরে ঘাড়ে করে নিয়ে হাজির। দিন নেই, রাত্তির নেই, এক ভাব, আশ্রমে কান পাতাবার জো নেই।"

শিবু বলিল, "আমি ভেবেছিলাম ওই রকম একটা কিছু। আফিঙের দলাটলা খাইয়েছিল তো কাপালিক? কিন্তু খুড়ো, আমাদের কথা হচ্ছিল খাবার নিয়ে, খাবার আর নেশার মধ্যে যে বিস্তর তফাৎ আছে, এটা..."

খুড়ো বলিলেন, "তোরা বাগড়া দিস্‌নি বাপু পদে পদে, বাঘের অমন

নিরীহ অবস্থা দেখেই বলে কাপালিকের ঘুম ছুটে গেছে কোন অনাচার-টনাচার হয়েছে ভেবে, সে আবার তার ওপর আফিং খাওয়াতে যাবে! সে সব কিছু নয়, কাপালিক যে বাঘের ধকলটা কেন সহ্য করত, আর বাঘও ও রকম মিইয়ে যেতে কেনই বা নার্ভাস্ হয়ে উঠল, সেটা জানতে হ'লে তন্ত্রবাদের গোড়ার কথাটা বোঝা দরকার। তোরা বুঝিস্-সুঝিস্ না, তান্ত্রিক দেখলেই মুখ ফেরাস্, মনে করিস, সব-পঞ্চ-মকার আঁকড়ে বসে আছে। আসলে কিন্তু তা নয়, পঞ্চ-মকার ত্যাগ করবার জন্যেই ওদের সাধনা। ওদের কথা হচ্ছে—দুর্বলতাকে পায়ে মাড়িয়ে শক্তিকে লাভ করতে হয়, দুর্বলতাকে এড়িয়ে শক্তিকে লাভ করা চলে না। পায়ে মাড়াও, সেগুলো তোমার দাস হয়ে থাকবে। এড়িয়ে যাও, বাঘের পেছনে ফেউয়ের মতো তোমার পিছু নিয়ে তোমায় উস্তম-ফুস্তম করে মারবে। মানুষের সবচেয়ে বড় রিপু, যা আদি রিপু, কারণ-বারি ইত্যাদি সব রকম আনুষঙ্গিক জুটিয়ে দেহ-মনকে সব রকমে সেই রিপুর অনুকূল করে নিয়ে ওরা সেই রিপুকে, সঙ্গে সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গ সব রিপুগুলোকেই জয় করে। এই হ'ল তন্ত্রসাধনা, এই হ'ল আত্মাশক্তির বেদীতে পশুবলি, এ বলি না পেলে তিনি ধরা দেন না। শুঁটকো শুঁটকো ছাগলগুলোকে প্রতিমার সামনে ঝপাঝপ কোপ মেরে মদের চাট করলেই যে তন্ত্রসাধনা হ'ল, তা নয়।··· যাক্; যে দুর্বলতার কথা হচ্ছিল,—ছটা রিপুর ওপরেও আবার কতকগুলো দুর্বলতা আছে মানুষের, একটা দুর্বলতা হচ্ছে ভয়, তেমনি দয়াও আবার একটা দুর্বলতা।···এটা ললিত মাস্টার বুঝবে, দয়া করে যদি রোজ পিটতে পিটতে ছেলেগুলোকে বেঞ্চির নিচে গড়াগড়ি না দেওয়ায় তো বড় হয়ে···"

ললিত মাস্টার বলিল, "ব্যস্, একটু যদি কুটুস করে কামড় দেবার সুবিধে পেলে তো···"

খুড়ো বলিলেন, "একটা উদাহরণ দিলে বোঝে ভালো।···কি বলছিলাম, হ্যাঁ, ভয়ের যে এই উৎকট অয়োজন, একটা গোটা বেঙ্গল টাইগার আশ্রমটার

মাঝে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, সাধনার একটু ব্যতিক্রম হ'লেই ঘাড়টি মটকাবে, কাপালিকের পক্ষে ছিল এটাও একটা সাধনার অঙ্গ। বাঘের এই দাপটের মধ্যে মনকে ঠিক রেখে সাধনমার্গে সে আর এক ধাপ উঠে যেতে চাইছিল। এমন সময় ওই ব্যাপারটুকু হ'ল, ওতে বাল্মীকি ঋষি খুশি হতেন আর একটি বাঘ আশ্রমধর্মে কন্‌ভার্টেড হ'ল মনে করে; কিন্তু কাপালিক হ'ল না।

"যেদিনকার কথা, সেদিন তিথিটা অমাবস্যা, তায় শনিবার, তন্ত্রশাস্ত্রমতে একটা দুর্লভ যোগ। সন্ধ্যে থেকে আকাশ ঘিরে মেঘ করে এসেছে, উপচার-টুপচার সব ঠিক করে কাপালিক যখন আসনে বসলো, অল্প অল্প করে বেশ জোরে বর্ষা নামলো। তোমাদের মত নিরীহ ভালো মানুষদের পক্ষে যেমন পূর্ণিমা-রাত, মলয়-হাওয়া,—তান্ত্রিকদের পক্ষে সেই রকম অমাবস্যা, শনিবার আর এইরকম দুর্যোগ—পেলে মেতে ওঠে একেবারে। তার ওপর আবার বছরের ঐ সময়টা সোঁদরবনের কাপালিকদের একটা মরসুম। যত আনাড়ি সব দেশ-বিদেশ থেকে সংগমস্নান করতে আসে, একটু যদি দল ছেড়ে ছিটকে পড়ল তো নির্ঘাত ওদের কারুর না কারুর হাতে।

"কাপালিকের কপালে সেবার দুটো জুটে গেছল, পরে নবকুমার নিয়ে তিনটে। দিন তিনেক আগে একটাকে বলি দিয়েছিল। একটা জীয়নো আছে, চমৎকার যোগ, কাপালিক ঠিক করছে, আজ এটিকে উৎসর্গ করবে। আর এমন একটা রাতে দেবার পায়ে উৎসর্গ করবার জিনিসও বটে। এই দীর্ঘ গৌরকান্তি চেহারা, সাত্ত্বিক মানুষ, শরীর থেকে পুণ্যের জ্যোতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে, শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্, আর অত তেজেও চক্ষু দুটি করুণায় ভরা। কাপালিক যখন ছলনা করে নিয়ে এল, একটু চাঞ্চল্য নেই মনে। শুধু জিজ্ঞেস করলে, 'বামাচারী কৌলোহসি?' কাপালিক উত্তর দিলে, 'এবমেব'।...'অস্তু, শাস্ত্র-বিচারং যাচ্ঞামি।' তার মানে—'বেশ, তর্কে আমায় পরাস্ত করো, তারপর তোমার যেমন অভিরুচি ক'রো, আপত্তি

নেই'—কথাটা যে রোখ দেখিয়ে বললে, তা নয়। সে যুগের রেওয়াজই ছিল,—বিত্তের গুমর ছিল মানুষের। শাস্ত্র-বিচারে হারা মানেই মরা, তারপর তুমি যা করো। কাপালিক কোণঠাসা হয়ে চটে উঠল, বললে, 'অসার তর্ক আমার অস্ত্র নয়, আমার যা অস্ত্র তার পরিচয় তুমি যথাসময়েই পাবে, ততক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকো,' বলে পিঠমোড়া করে বাঁধতে যাবে, ব্রাহ্মণ শান্তভাবে হেসে বললে, 'আমায় বাঁধবার কোনই দরকার নেই। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, তৃণাদপি তুচ্ছ, আমার এই নশ্বর শরীরের দ্বারা তোমার দেবীর যদি সন্তোষ-বিধান হয় তো স্বচ্ছন্দেই এবং সানন্দেই তা অর্পণ করব। বন্ধন নিতান্ত করো, তাতেও রাজি আছি, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই ; চলো, তোমার পূজার পাশে, তোমার দেবীর বেদীমূলে আমি গিয়ে বসছি।'...এ যত ঠাণ্ডা করতে চায়, কাপালিক ততই গরম হয়ে ওঠে —পূজোই বলো, যাই বলো। আসলে খুনের নেশায় রক্ত মাথায় উঠেছে তো। বললে, 'ব্রাহ্মণ, তুমি অতি প্রগল্‌ভ. তোমার পরিচয় দাও।' ব্রাহ্মণ সেই রকম শান্তভাবেই বললে, 'কি করবে পরিচয় নিয়ে? মানুষ সৃষ্টির মধ্যে এতই নগণ্য যে, তার ঐহিক মর্যাদা আকাশচুম্বী হ'লেও সে তৃণের চেয়েও সুনীচ ; আমি অমুক জায়গার মঠধারী, ভগবানের সামান্যর চেয়েও সামান্য যে সেবক, তার আমি দাসানুদাস।' ও যত নীচু হচ্ছে, এ ততই যাচ্ছে ক্ষেপে ; খানিকক্ষণ পরে বললে, 'ওসব ধাপ্পাবাজী চলবে না। তোমার দিকে আমার মন পড়ে থাকবে, আমি দেবীর চরণে মন বসাতে পারব না ; অথবা যদি পারিই, দেবীর অনুগ্রহ হয়, তুমি আমার সেই সমাধিস্থ অবস্থার সুযোগ নিয়ে চম্পট দেবে ;—অকেলং নাতি-বিশ্বসেৎ—যারা অতান্ত্রিক তাদের বেশি বিশ্বাস করা শাস্ত্রসম্মত নয়। তোমার ভীরু কাতর দৃষ্টিতে শক্তির পূজায় ব্যাঘাত হতে পারে, তাই তোমায় বদ্ধ অবস্থায় এইখানেই ফেলে রাখছি ; রজনীর তৃতীয় যামে আজ দেবী বলিদান গ্রহণ করবেন, সেই সময় তোমায় নিয়ে যাব, মনকে তুমি প্রস্তুত করে

রাখো। কিঞ্চিৎ আহার্য চাও?' মঠধারীর একটুও রাগ নেই, একটুও দ্বেষ নেই, একটুও হিংসে নেই, বললে, 'তোমার দাসানুদাসের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে যদি দাও, আপত্তি নেই ; আহার্যের আস্বাদনের জন্যে বলছি না, তোমায় নিমিত্ত করে গোবিন্দ যে করুণা বিতরণ করছেন, সেইটুকুর জন্যে বলছি, নিয়ে এসো।'

"বলে—চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। কাপালিক ওসব কথায় কান দেবে কেন? ওর পক্ষে সবই তো ভেঁপোমি? তা ছাড়া পূজোর সময়ও হয়ে আসছিল, আর মেলা বাক্যব্যয় না করে মঠধারীকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেললে, তারপর একটা বেশ বড় সরা করে এক সরা ফল কেটে সামনে রেখে বললে, 'চতুষ্পদের মতো শুধু মুখের সাহায্যেই এগুলি ভক্ষণ করবে। আর একটা কথা, এই পুণ্য শক্তি-আশ্রমের প্রহরী এক ব্যাঘ্র। সে একটু কানন-বিহারে গেছে, এলো বলে। সাবধান, পালাবার চেষ্টা কোরো না। এসো বরং আরও দু-এক পাক কষে দিই।' মঠধারী বললে, 'অস্থি, মেদ, অস্ত্রের শত পাক দিয়ে শরীর আত্মাকে বেঁধে রাখতে পারে না, রজ্জুর শত পাক দিয়ে আপনি এই নশ্বর শরীরকে কতক্ষণ বেঁধে রাখবেন?' কাপালিক রেগে কটমটিয়ে একবার মঠধারীর দিকে চাইলে। জিজ্ঞেস করলে, 'এ রহস্যের অর্থ?' ঠিক এই সময় আশ্রম কাঁপিয়ে বাঘ লাফিয়ে এসে পড়ল। কাপালিক কড়া চোখ মঠধারীর ওপর ফেলে বললে, 'সাবধান আমি চললাম, ওই তোমার প্রহরী সমাগত।'...শিবু, কলকেটাতে আর কিছু নেই, আর একবার সেজে দিয়ে যেতে বল্।"

শিবকালী বলিল, "তুমি থেমো না খুড়ো, বাঘটাকে ঠিক জায়গায় এনে ফেলে—এও তোমার একটি রোগ। আমি অলরেডি আর একটা কলকে ভর্তি করতে ইশারা করে দিয়েছি, এলো বলে।"

খুড়ো বলিলেন, "গোড়াতেই বলেছি, কাপালিক সে রাত্তিরে খুব তোড়জোড় করে পূজোয় বসলো। আসনেও বসলো, আর ওদিকে বৃষ্টিও

নামলো। সোঁদরবনের গভীর জঙ্গল, অমাবস্যার মতো রাত, শনিবার, তায় আকাশে ওই রকম দুর্যোগ, তার ওপর দেবীর পূজোর সবচেয়ে বড় উপচার নরবলি। সিদ্ধি হাতের মুঠোর মধ্যে। কাপালিক প্রাণ ঢেলে দিলে পূজোর মধ্যে। যোগাযোগের মধ্যে যদি কিছু বাকি ছিল তো সেটা পুরো করে দিলে বাঘটা। সে রাত্রে কি তার লম্ফঝম্ফ! কি গর্জন! দুদিন আগে যে মানুষটাকে বলি দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে গিলে ম্যান্-ইটার হয়ে গেছে কিনা, একটা নেশা চড়ে গেছে মানুষের জন্যে, একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছে। তারপর এসে দেখে, আর একটা হাজির। বন তো সে তোলপাড় করে ফেলতে লাগল।

"এত সুযোগ, এদিকে কিন্তু এক কাণ্ড হচ্ছে, কাপালিক কোনমতেই পূজোতে মন বসাতে পারছে না যতই চেষ্টা করছে, কারণের ওপর কারণ চড়িয়ে মনটাকে টেনে রাখতে চেষ্টা করছে, মনটা ততই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। রাত্রি তৃতীয় যাম যখন হয়ে গেছে, বলি দেবার সময়, কাপালিকের তখনও পূজোর গোড়ার অঙ্গগুলিই শেষ হয় নি। এমন বিঘ্ন হ'লে তান্ত্রিকদের যা হয়, সব বিভীষিকাগুলো—শনিবার, অমাবস্যা, দুর্যোগ, বাঘের গর্জানি, ওদিকে বলিপ্রার্থী দেবীর সঙ্গোপাঙ্গ সব ডাকিনী-যোগিনী—কারণের নেশায় সব চতুর্গুণ ভয়ংকর হয়ে উঠেছে তার মনশ্চক্ষুর সামনে। ভয়ে তার মন্ত্রে ভুল হয়ে যাচ্ছে, পদ্ধতিতে গোলমাল হচ্ছে, মাথা ক্রমেই যাচ্ছে গুলিয়ে, আর যতই গুলিয়ে যাচ্ছে, ততই সে সেটাকে এক্তিয়ারে আনবার জন্যে কারণের ওপর কারণ চাপাচ্ছে। এই করতে করতে এক সময় আর নিজেকে সামলাতে পারলে না, চরম নেশার উত্তেজনার পরই ঝিমিয়ে আসনে গড়িয়ে পড়লো।

"যখন চোখ খুললে, তখন অনেকটা বেলা হয়েছে। প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলে না, কোথায় আছে, কি বৃত্তান্ত, কিছুই না। তারপর আস্তে আস্তে জ্ঞান হ'ল। পূজোর সরঞ্জাম যেমন তেমনই পড়ে আছে, শুধু কারণের

পাত্র একেবারে শূন্য। আস্তে আস্তে রাত্তিরের সব কথা মনে ফিরে এলো—মঠধারী, তার সঙ্গে তর্ক, পুজোয় বিঘ্ন, বাঘের অতিরিক্ত দৌরাত্ম্য। বাঘের কথা মনে হ'তেও তার খেয়াল হ'ল, কই, বাঘের শব্দ তো একেবারেই নেই! কাপালিক আসন ছেড়ে উঠে রাত্তিরে যেখানে মঠধারীকে বেঁধে ফেলে রেখেছিল, সেইখানে এলো।···চক্ষু চড়কগাছ—নো মঠধারী! কা কস্য পরিবেদনা! প্রথমটা ভাবলে, বাঘে সাবড়ে দিয়েছে। কিন্তু বাঘ তো তা করবে না। এর আগের বলি তিন দিন ওই বাঘের হেফাজতে ছিল, গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত দেয় নি; সেই থেকেই কাপালিক বুঝেছে, বাঘের মধ্যে রক্ষিকা-ডাকিনী কাজ করছে, সে দেবীর বলি চেনে। কিন্তু বাঘই বা কোথায়? খোঁজ, খোঁজ; শেষে পাওয়া গেল বাঘকে। আশ্রমের এক পাশ দিয়ে একটা কালো জলের সুঁতি বয়ে গেছে, তার ধারেই একটা তমালগাছ। সেই গাছের তলায় দুটি থাবার ওপর মুখ রেখে বাঘ চুপ করে পড়ে আছে। ডান থাবায় একটি মোটা তুলসী-কাঠের মালা জড়ানো, পরম ভক্তিভরে জিব দিয়ে আস্তে আস্তে সেটা চাটছে। আর সেই যে ফলের সরাটা মঠধারীকে দেওয়া হয়েছিল, সেটা বাঘের বাঁ থাবার নিচে, কয়েকটা টুকরো ফল তখনও পড়ে রয়েছে সরায়। পূজো দিলে ফলে-সন্দেশে যেমন সিঁদুর লেগে থাকে, সেই রকম সিঁদুরের দাগ ফলে সরায় লেগে রয়েছে।

"কাপালিক একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বুঝলে, এ সেই কপটাচারী মঠধারী বাবাজীর কাজ! যখন সে বললে, বন্ধনের দ্বারা তার নশ্বর শরীরকে আবদ্ধ রাখা যাবে না, তখনই কাপালিকের সন্দেহ হয়েছিল—সে যাদুবিদ্যা জানে, তারই বলে সে নিজেকে মুক্ত করেছে, তারপর বাঘটাকে মন্ত্রপূত ফল খাইয়ে নিবীর্য করে দিয়ে সটকে পড়েছে। কাপালিক বাঘটার সামনে এসে বললে, 'উত্তিষ্ঠ।' আমাদের পোষা কুকুরে যেমন দু-একটা কথা বোঝে, বাঘটাও কাপালিকের সেই রকম দু-একটা কথা বুঝতো,

মেনেও চলতো। এবারে কিন্তু 'উত্তিষ্ঠ' বলতে আরও নিচু হয়ে কুঁইকুঁই করে পায়ের কাছে মুখ দিয়ে, গড়িয়ে, ল্যাজ নেড়ে একশা করে দিলে। কাপালিক ঘেন্নায় পিঠে দুটো লাথি বসিয়ে গেল মঠধারীর খোঁজে, মন্দিরে গিয়ে বলির খাঁড়াটা হাতে করে নিয়ে এলো।

"তন্নতন্ন করে খুঁজলে সমস্ত দুপুর—দেবভাষায় যতটা গালাগাল দেওয়া চলে—'ভণ্ড, কপটাচারী, কাপুরুষ, যদি কিছুমাত্র মর্যাদা জ্ঞান থাকে তো অবিলম্বে সম্মুখীন হবি, তুই ব্যাঘ্রকে কুক্কুরে পরিণত করেছিস, আয় এক্ষণে তোকেও আমি কুক্কুরের মতোই বধ করব।'—কার আসতে বয়ে গেছে?"

খুড়ো একটু বেদম হইবার জন্যই হোক্ বা যে জন্যই হোক্, চুপ করিয়া হুঁকায় মন দিলেন।

শিবু বলিল, "এও প্রায় তোমার সেই আফিং খাওয়ানোর মতনই হ'ল খুড়ো। ফল মন্ত্রপূত করে খাওয়ালে বাঘ ভেড়া হয়ে গেল, এতে স্বাভাবিক খাবারের সঙ্গে স্বাভাবিক মনের সম্বন্ধ···"

খুড়ো হুঁকায় একটা সুখটান দিয়া বলিলেন, "শেষে একটেরেয় একটা খালের ধারে মঠধারীর সন্ধান পাওয়া গেল। সমস্ত জায়গাটা রক্তে মাখামাখি, আর গোটাকতক টাটকা হাড় এদিক ওদিক ছড়ানো রয়েছে। কাপালিক থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"বাঘটাকে আবার বাঘ করে ফেলবার চেষ্টা করলে, তুকতাক, পূজো, মানসিক—উঁহুঃ, সে মঠধারী বৈষ্ণবের মাংস খেয়েছে—পঞ্চাশ বছরের একটা পাকা বৈষ্ণব, আর কখনও হিংসের দিকে যেতে পারে? আর সে লম্ফঝম্ফ দিতে পারে? আর সে উৎকট হুংকার তার আসে?

"অনেক ভেবে চিন্তে কাপালিক বেরুল একটা শাক্ত বলির খোঁজে। নবকুমারকে পেলে, পেয়েই জিগ্যেস করলে, 'কস্ত্বম্? শাক্ত বৈষ্ণবো বা?' ···আর একবার চা দিতে বল্, গলা শানিয়ে তবে তোদের খুড়ীর দিকে এগুতে হবে।

খানিকক্ষণ চুপচাপের পর ললিত মাস্টার বলিল, "খুড়ো, আজ তুমি চরম করে দিলে বাবা, একেবারে মালা জপিয়ে পর্যন্ত ছাড়লে…"

খুড়ো বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বাঃ, তা আবার কখন বললাম? তোমরা যদি ধরে নাও…! ঘাড় মটকে খাবার সময় মালাটা কি করে থাবায় জড়িয়ে গিয়ে থাকবে। অনেক সংগতিপন্ন বৈষ্ণবেরা তখন আবার সোনার তার করে মালা গাঁথতো, ছিঁড়তে পারে নি। রক্ত লেগেছিল, চাটছিল।…নাঃ, তোমাদের কাছে গল্প করে সুখ নেই, নিজেই কালিদাস হব, আবার নিজেই মল্লিনাথ হতে হবে?"

এর পর সরার সিঁদুর-মাখানো ফলের কথাটা কেহ আর তুলিতে সাহস করিল না।

[শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৯]

ভূতনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা

নগেন কাকা ডাকিয়া বলিন, "শৈলেন, তোমার ফুরসুৎ হবে?—বেশি নয়, এই ধর দু' তিনটে দিন?"

প্রশ্ন করিলাম, "কেন বলুন তো?—এখন তো ছুটিই রয়েছে।"

একটু কিন্তু হইয়া বলিলেন, "কাজ তেমন কিছু নয়; আসল কথা ভূতোর ইচ্ছেটা তুমিও সঙ্গে যাও। এখন পাঠাবার ইচ্ছে ছিল না: তবে বেহাই বড্ড কাকুতি-মিনতি করে লিখেছেন; না পাঠালে ভাববেন, আমরা সেই পুরোণ কথা ধরে বসে আছি···ভূতো এদিকে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছে—'শৈল না হ'লে কোন মতেই যাব না'।"

আসল কথাটা তা' নয়। নগেন কাকা ছেলের বিবাহ দিয়া রীতিমত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। এমনটা যে হইবেই, তাহা তিনি জানিতেন নিশ্চয়; কিংবা যদি পুত্রস্নেহে নেহাৎ অন্ধ হইয়া ছিলেনই, তো তাঁহার হিতার্থীরা তাঁহার চোখ ফোটাইয়া দেওয়ার ঢের চেষ্টা করিয়াছিল। শেষ দিন পর্যন্ত বাবা গিয়া বুঝাইয়াছেন,—"ছেলেকে আশীর্বাদ করতে আসছে, এখন আর আমাদের বলা ভাল দেখায় না; তবে যেন মনে হচ্ছে বিয়েটা এখন না দিলেই ভাল করতে। অতিরিক্ত দুরন্ত ছেলে, এক মুহূর্ত মারামারি ডাংপিটেপনা না করে থাকতে পারে না, 'না না' করেও বছরে কোন্ না দু'তিনবার শ্বশুরবাড়ি পাঠাতেই হবে,—ভেবেছ কি কোন একটা উপদ্রব না করে ছাড়বে ও ছেলে?···দেখ, তোমার ছেলে, পাড়ার আমরা শুধু বলতেই

পারি।…আজ সকলের খবরটা শুনেছ তো? ভাগীরথের জামাই একটি ঠাট্টা করেছিল, আর কিছু দোষ নয়…তা' বিয়ে দিলে তো ছেলেকে তোমার ঘেরেঘুরে সেখানে ঠাট্টা করবেই বাপু—বাসর ঘর থেকেই আরম্ভ হবে,—তা' সেই অপরাধে যদি তাদের নড়বড়ে দাঁত নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয় তো…"

অবশ্য বিবাহ ব্যাপারে—শুধু বিবাহ ব্যাপারেই কেন?—সংসারের যে কোন ব্যাপারেই নগেন কাকার বিশেষ কিছু হাত ছিল না। ভাগীরথের জামাই-ঘটিত ব্যাপারটা খুব গুরুতর হইয়াছিল; নগেন কাকা জড়সড় হইয়া অনেকবার ভিতরে গেলেন, অনেকবার বাহিরে আসিলেন, তার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বাবার মন্তব্যের পাশে আরও অনেকের উগ্রতর মন্তব্য আসিয়া জমা হওয়ায়—মরি কি বাঁচি করিয়া কথাটা জগোপিসীর কাছে হাজির করিলেন।

জগোপিসী জপ করিতেছিলেন। বলিলেন, "বন্ধ করে দে।" তাহার পর আবার, জপ ভাঙিয়া কথা কহার জন্য, আচমন করিয়া মালা ঘুরাইতে লাগিলেন।

নগেন কাকা চুপ করিয়া বসিয়া উপযুক্ত সাহস সঞ্চয় করিয়া লইলেন। তাহার পর পূর্বের চেয়েও ভয়-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "না, বন্ধ করার কথা নয় দিদি,—বলছিলাম—একটু জ্ঞানগম্যি হোক্…"

জগোপিসী মালা থামাইয়া ঘুরিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আর যদি সেই বুড়ো বয়েস পর্যন্ত গিয়ে জ্ঞানগম্যি হয়—কিংবা, বাপের মতন যদি তাও নাই-ই হয়?"

নগেন কাকা এরকম সাক্ষাৎ আঘাতে একেবারে থতমত খাইয়া গেলেন। জগোপিসীর মালাশুদ্ধ হাতটা কাঁপিতেই ছিল, কথা কহিতে কহিতে সংযত রাগে গলাটাও কাঁপিতে লাগিল, বলিলেন, "ও বিয়ে

হবে না; এই তোমায় নিকে দিচ্ছি। আমার ভূতনাথের গলায় মালা দেবে, সে মেয়ে এখনও তপিস্তে করছে। বউও না দেখতে পেয়ে আপ্‌সে আপ্‌সে মোলো, আমায়ও ভূতনাথের কনের মুখ তুই দেখতে দিবিনে, সে জানি; আপশোষ শুধু বউয়ের মত তাড়াতাড়ি যেতে পারছি না—মাকণ্ডের পেরমায়ু নিয়ে বসে আছি···তোমার ছেলে, দিও না বিয়ে; কিন্তু এই যে ক'জন ভদ্দরলোক আসবে, তাদের একটু বসাবার, একটু মিষ্টিমুখ করবার বন্দোবস্তও তো করতে হবে, না, পাড়ার হিংসেকুটেদের পরামর্শে তাদের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিতে হবে? দিদির চেয়ে পাড়াপড়শিরাই যদি তোমার বেশি আত্মীয় হয়ে থাকে তো, পাড়ার অমুক দাদা কি তমুক খুড়ো—এরাই যদি তোমার···"

বাড়ির সীমানা ছাড়াইয়া কথাগুলা পাড়াপড়শিদের নির্দিষ্ট কর্ণে পৌঁছায় দেখিয়া নগেন কাকা উঠিয়া গেলেন।

গোড়ার ইতিহাস এই।

ভূতনাথ যে আমায় তাহার শ্বশুরালয় লইয়া যাইবার জন্য ধনুক-ভাঙা পণ করিয়াছে, এমন নহে; তবে নগেন কাকা যে আমায় ডাকিয়া বলিলেন—তাহার কারণ, সবার একটা বিশ্বাস আমি নাকি ভূতনাথকে একটু মানাইয়া লইতে পারি। সম্পূর্ণভাবেই যে আমি এ দুর্লভ যশের ন্যায্য অধিকারী তা নয়, তবে ভূতনাথের ধাতটা খানিকটা বোঝা আছে এবং সেই জন্য সুযোগমত কথাবার্তার মোড় ফিরাইয়া, যেটা রক্তপাত হইতে পারিত, সে-ব্যাপারটাকে কপাল ফোলায় কিংবা চোখের নিচে কালসিটেয় দাঁড় করাইয়াছি, এই।

আমি বলিলাম, "তা মন্দ কি, দেখেই আসি না ভূতনাথের শ্বশুর-বাড়িটা।"

মুখের ভাবে বোঝা গেল, নগেন কাকা খুব খুশি হইয়াছেন—যেন

একটা দারুণ সমস্তার সমাধান হইল। বলিলেন, "তা যখন ইচ্ছাই বাবা, একটু নজরও রেখো ছোঁড়াটার ওপর ; অবিশ্চি তোমায় কোন হেপা পোয়াতে হবে না, আমি সঙ্গে রঙ্গীকে দিচ্ছি।"

রঙ্গীর ভালো নাম রংলাল, এদের অনুগত ব্যক্তি। ভাললোক, কাজে কর্মে আসিয়া গতর খাটায়, প্রয়োজন হইলে তত্ত্বতালাসটাও পৌঁছাইয়া দেয়। লোক ভালো, তবে একটু ধূমপান দোষ আছে—অবশ্চ বিড়ি-হুঁকা নয়, আর একটু উচ্চাঙ্গের ব্যাপার।

ছেলেবেলায় রঙ্গীকে আমরা ভৃঙ্গী বলিয়া ক্ষেপাইয়াছি।

ভূতনাথের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া স্থির হইয়া গেল।

রঙ্গী গিয়া স্টেশন থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি লইয়া আসিল। আমরা তখন বাড়ির ভিতরে ; জগোপিসী দইয়ের ফোঁটা, কড়ে আঙুলে কামড়ানো প্রভৃতি নানারকম মঙ্গলাচরণ করিয়া ভাইপোর যাত্রা নিরাপদ করিতেছিলেন, গাড়োয়ান হাঁক দিল, "জলদি লেবেন বাবু, চার ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখবেন না।"

ভূতনাথ উগ্রচোখে আমার দিকে চাহিল, প্রশ্ন করিল, "শুনছিস্ তো শৈলেন ?—চার ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে এর মধ্যে ?"

সঙ্গে সঙ্গে—"দেরি নেই, এই এলাম বলে"—বলিয়া মুষ্টিবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইল। পিসীমা চাদরের আঁচলে সিদ্ধির পাতা বাঁধিয়া দিতেছিলেন, হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন, "হ'ল আবন্ত হতভাগার, কেন, কি এমন বলেছে যে মারমুখো হয়ে ছুটলি ?"

"চার ঘণ্টা বললে কেন ?"

"ওর খুশি, কোন আইনে বারণ আছে ?"

আমি কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ার জন্ত বলিলাম, "তাগাদা দিচ্ছে সে তো আমাদেরই উপকার করছে, কি বল জগোপিসী ?—দেরি হয়ে গেলে

আমাদেরই লোকসান—ট্রেন্ ফেল করে আবার গুনগার দিয়ে গাড়িভাড়া করে ফিরে এস…"

ভূতনাথের নিঃশ্বাস একটু ঘন হইয়া আসিয়াছিল, উত্তর করিল, "চার ঘণ্টা বললে কেন ?"

বাহির হইতে আবার তাগাদা আসিল, "হ'ল বাবু ?"

রঙ্গী বাহিরে ছিল, উত্তর করিল, "আরে, হচ্ছে হচ্ছে ; তুমি যে তাগাদার চোটে…

ভূতনাথ চেঁচাইয়া বলিল, "তুই ছেড়ে দে রঙ্গী, আমি নিজেই যাচ্ছি।"

আমি প্রমাদ গণিলাম—যাত্রার শুরুতেই একটা বুঝি কিছু হয়। এদিকে, গোড়াতেই বিঘ্ন হওয়ায় জগোপিসী মাঙ্গলিকের ফিরিস্তি আবার বাড়াইয়া দিলেন। আমি বলিলাম, "তুই তা'হলে এগুনো সেরে আয়, আমি ও ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করে রাখি গিয়ে।"

ভূতনাথ বলিল, "ঠাণ্ডা করা তোর কর্ম নয়, আমি আসছি, ওর 'চার ঘণ্টা' বলা বের করব তবে আমার নাম ভূতনাথ ?"

তাগাদা আসিল, "আর কতকক্ষণ লেবেন বাবু ?"

আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছিলাম, জগোপিসী বলিলেন, "আর অমনি রঙ্গীকে বলে দে বাবা, ঘোষালদের আমগাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে আস্থক, পূর্ণ ঘটের জন্যে। গোড়াতেই এ কি বিঘ্ন বল্ দিকিন !"

বাহিরে আসিতে আসিতে শুনিলাম, "ও তাগাদা দিক্ না রাত বারোটা পর্যন্ত, কিছু বলছি ?—কিন্তু এসেই 'চার ঘণ্টা'র কথা বললে কেন ?—চার ঘণ্টা ! চার ঘণ্টার মানেটা কি ?"

রঙ্গীকে আম ডাল আনিতে পাঠাইলাম। ওরও মেজাজ বড় অনিশ্চিত, গোলমালের সময় দূরে দূরে থাকে সেই ভাল।

গাড়োয়ানকে বলিলাম, "এই যে তুমি দেখছি,—আমাদের মিয়াসাহেব !

ও ঘোড়াটা তো আগে দেখিনি তোমার গাড়িতে, নতুন কিনেছ বুঝি ?…"

সত্য কথা বলিতে গেলে মিয়াসাহেবকেও এর পূর্বে দেখি নাই, তাহার গাড়িও নয়, তাহার ঘোড়াও নয়। কিন্তু উদ্দিষ্ট ফল পাওয়া গেল। গাড়োয়ান সেলাম করিয়া বলিল, "এজ্ঞে, এই এদিনকে কেনলাম ; সায়েবের বাড়ির গাড়ি টানছিল, এখনও ভালো করে জোড়ে বসেনি, তাই একা একাই জুতে চালাচ্ছি দিনকতক।"

"সাহেবের বাড়ির জিনিস সে তো তুমি-না বলতেই বুঝেছি, ওর গায়ে লেখা রয়েছে। টাকা দিতে হয়েছে নিশ্চয় মোটা রকম ?"

সুস্পষ্ট হাড়ের উপর সরুমোটা শিরা-উপশিরার বাহুল্য,—পড়িতে জানিলে অশ্বটির জীবনেতিহাসের অনেক কিছুই পড়া যায়। মিয়াসাহেব একবার পিঠে দুইটি চাপড় দিয়া বলিল, "সে কথা আর বলবেন না কর্তা, জিনিসটা পছন্দ হ'ল, টাকার কথা আর ভাবলাম না।"

"ভালো করেছ, টাকাই কি দুনিয়ায় সব ?"

রঙ্গী আমের ডাল লইয়া আসিল, বলিলাম, "ভেতরে নিয়ে যাও, আর ভূতনাথকে ডেকে নিয়ে এস, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। মিয়াসাহেব জানা-শোনা লোক, তবু…"

গাড়োয়ান একটু গদগদ হইয়া হইয়া বলিল, "এজ্ঞে, দেরি ওরকম একটু হয়ই কর্তা, আপনিও যেমন ; সওয়ারি আসবে বলে লোকে তো আর পা বাড়িয়ে থাকে না…

আমায়ই যেন বুঝাইয়া শান্ত করিয়া একটু হাসিল।

অবশ্য বিলম্ব আর অধিক হইল না। বাহির হইতে কোন তাগাদা না হওয়ায় ভূতনাথের মেজাজটা অবিচলিত রহিল, ফলে কোন রকম আর 'বিঘ্নি' না হওয়া হওয়ায় জগোপিসার যাত্রানুষ্ঠানের তালিকাও আর বৃদ্ধি পাইল না। একটা ভয় ছিল—দু'জনের সাক্ষাৎ সময়টা, সেটাও ভালয় ভালয় কাটিয়া গেল। গাড়ি-ঘোড়াকে আভিজাত্যের কোঠায় তুলিয়া দিয়াছিলাম, ভূতনাথ

আসিতেই গাড়োয়ান একটা সেলাম করিয়া আমাদের জন্য দরজাটা খুলিয়া দাঁড়াইল। "চার..." বলিয়া ভূতনাথ কি শুরু করিতে যাইতেছিল, আমি তার হাতটা টিপিয়া দিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলাম।

প্রথম ঝোঁকটা কোন রকমে কাটানো গেল।

ট্রেনের একটু দেরি ছিল। প্ল্যাটফর্মে একটা নিরিবিলি জায়গায় দুজনাকে দাঁড় করাইয়া বলিলাম, "তোরা এখান থেকে নড়িস নি যেন, আমি টিকিটগুলো কিনে নিয়ে আসি।"

ভূতনাথ প্রশ্ন করিল, "টিকিট কিনবি নাকি?"

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, "টিকিট কিনব না?—ধরবে যে!"

ভূতনাথ একটা চলতি গালাগালি প্রয়োগ করিয়া জানাইল 'ভূতো'কে ধরিবার মতো কাহার মুরোদ আছে তাহাকে একবার দেখিবার বড় সাধ ছিল তাহার।

আমি বলিলাম, "না, শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিস্ ভূতনাথ, পথে দাঙ্গা বাধাতে বাধাতে যাওয়াটা কি ভালো? মনে ফুর্তি নিয়ে যাওয়াই ভালো নয় কি?... কি বলোগো রঙ্গী?"

"আজ্ঞে, কথাই তো। একটু থামিয়া বলিল, "তবে কি জানেন?—যার যা'তে ফুর্তি...দা'ঠাকুর সেই কথা বলছেন আর কি।"

ও আবার ধুনা দিতে আরম্ভ করিল! বলিলাম, "সব জায়গার জন্যে তো সব রকম ফুর্তি নয় রংলাল। গ্রামের সমবয়সীদের সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি, কি রাগের মাথায় ছোটখাট একটা কিছু হয়ে গেল, সে আলাদা কথা, কিন্তু এখানে ধরো শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, যদি কপাল ফাটিয়ে কি জামাকাপড় ছিঁড়ে..."

রঙ্গী গোঁফ ফুলাইয়া আমার দিকে কড়া চোখে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "কপাল ফাটাবে—কোন্ সে সুমুন্দির পুৎ, শুনি দা'ঠাকুর? রঙ্গা বেঁচে থাকতে?"

মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো। আর ইহাকে কিনা নগেন কাকা পাঠাইয়াছেন ভূতনাথকে সামলাইবে বলিয়া? ওদিকে আর সময়ও বেশি নাই। আমি বলিলাম, "তোরা তাহ'লে থাক্ এইখানটায় একটু, ওদিকটা যাস্‌নি আবার ভিড়ের সময় খোঁজাখুঁজি করে মরতে হবে তা হ'লে; আমি এই এলাম বলে।"

আমার ফিরিতে অনিবার্যভাবেই একটু দেরি হইয়া গেল। এই সময়টা দুইদিক হইতে দুখানা ট্রেন আসে, টিকিটঘরের সামনে খুব ভিড়, তাহার মধ্যে ঢুকিয়া টিকিট কাটিয়া বাহির হওয়া, সে এক পুনর্জন্ম বলিলেও চলে। যা হোক্, সে হাঙ্গামাটা মিটাইয়া হন্তদন্ত হইয়া প্ল্যাটফর্মের দিকে অগ্রসর হইলাম, মনটা ও-দুটার কাছে পড়িয়া আছে, এতক্ষণের অনুপস্থিতি!

আণ্ডারওয়ে বাহিয়া সিঁড়ি দিয়া প্ল্যাটফর্মে উঠিতেই চক্ষুস্থির—না ভূতনাথ, না রঙ্গী—কাহারও চিহ্ন নাই!

প্ল্যাটফর্মের আদ্যন্ত একবার ভালো করিয়া চোখ বুলাইয়া লইলাম, বিশেষ করিয়া যেখানে যাত্রীদের ভিড়; দুজনের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। একটু আশার কথা—কোনখানে মারামারি, কিংবা মারামারিতে পৌঁছিতে পারে এরকম বিশেষ প্রকারের কোন তর্ক হইতেছে না। তবুও দু'জনের অদৃশ্য হওয়াটা চিন্তার বিষয় তো? ইহারা দুজনে একজোট হইয়া কি আমায় শেষ পর্যন্ত প্রতারিত করিয়া বাড়ি পলাইয়া গেল?

"এই যে দা'ঠাকুর!"

চমকিয়া ফিরিয়া চাহিরা দেখিলাম, রংলাল। প্রশ্ন করিলাম, "কি রে,—ভূতনাথ?"

"তানাকেই তো খুঁজছি, দা'ঠাকুর?"

"সে তো তোর পাশেই ছিল,—খুঁজছি কি বল্!"

প্রশ্নাদির দ্বারা যতটা বোঝা গেল তাহা এই—রঙ্গীর মেজাজটা আজ

সকাল থেকেই ভালো ছিল না। এই রকম মেজাজ লইয়া কুটুম-বাড়ি যাওয়াটা ভালো দেখায় না, অথচ সুযোগের অভাবে কোন উপায় করিয়া উঠিতে না পারায়, মেজাজটা ক্রমে আরও খারাপ হইয়া উঠিতে ছিল। আমি যাওয়ার পর রঙ্গী হঠাৎ বুঝিতে পারিল, এরকম মানসিক অবস্থার হেতুটা কি। তখন দাদাঠাকুরকে এক মিনিট অপেক্ষা করিতে বলিয়া ওদিকে গিয়া এক হিন্দুস্থানী ভাইয়ার নিকট হইতে কলিকাটি লইয়া দু'টি টান দিয়াছে—রঙ্গী বলিল, "পুরো দুটি টানও নয়, দা'ঠাকুর"—হঠাৎ ঘুরিয়া দেখে দা'ঠাকুর নাই।

রাগিয়া বলিলাম, "এরকম যে হবে, তা জানতামই, যত সব গেঁজেল নিয়ে কাণ্ড! ওই গাড়ির সিগ্‌নাল ডাউন হ'ল। চল, বাইরেটা একবার দেখি। যদি পালিয়েই যায় তো আমি আর কি করব? ও ছেলের আবার শ্বশুরবাড়ি!"

প্রথমটা গাড়ি-স্ট্যাণ্ডের কাছে গেলাম। চার ঘণ্টা দাঁড়াইবার কথা লইয়া বিদ্রূপটা ভূতনাথের মনে বড্ড লাগিয়াছিল। ওর স্বভাব হইতেছে, এক একটা সামান্য কথাও কখন কখন ওর মনে বড় লাগিয়া যায়। প্রথমটা রহিয়া রহিয়া সেটা আওড়াইতে থাকে, তাহার পর আর আওড়ায় না। এই অবস্থাটা বড় মারাত্মক, কেননা এই সময়টা কথাটা তাহার অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া উগ্রতর উত্তাপের সৃষ্টি করিতে থাকে।

গাড়িটা আড্ডায় ছিল না। কি করিব, চিন্তা করিতেছি, এমন সময় টিকিটঘরের দিকে একটা হৈ চৈ শোনা গেল। দু'জনে ছুটিয়া সেখানে গিয়া দেখি টিকিটের কাউণ্টারের বাহিরে লোকের ভিড়ের মধ্যে যেন একটা জট পাকাইয়া গিয়াছে—ভীষণ মারামারি! নিচে দু'টা লোক পড়িয়া, একটা শানের উপর, একটা তাহার উপর; ভিড়ের চাপে মাঝে মাঝে তাহাদের উৎক্ষিপ্যমান চারখানা পায়ের অতিরিক্ত আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। তাহাদের উপরে এলোমেলোভাবে ছাতা, ছড়ি, পুঁটলি, চড়, সুটকেস,

টর্চ বর্ষিত হইতেছে—বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, কাহার ঘাড়ে পড়িতেছে—কে বিপক্ষ, কে স্বপক্ষ—বর্ষণকারীদের মধ্যে সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা নাই বা ধারণা করিয়া লইবার ফুরসুৎও নাই। "দাঠাকুরের জুতো!"—বলিয়া আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া রঙ্গী গিয়া ভিড়টার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং একখানা চাপের মতোই সেটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া একটা পশ্চিমার হাত থেকে একটা বাঁশের লাঠি কাড়িয়া লইয়া বলিল, "চলে আয় সব!"

আমি এই সুযোগে ধরাশায়ী লোক দুইটাকে ছাড়াইয়া দিয়া তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহাদের আলাদা করিয়া দিলাম। উপরের লোকটি আমাদের ভূতনাথ। সম্পূর্ণ আলাদা অবশ্য একেবারে করা গেল না—খানিকটা আলাদা, খানিকটা সংলগ্ন হইয়া রহিল—ভূতনাথ, লোকটার বাবরিছাঁটা চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে লাগিল, আর লোকটা আমার পাশ দিয়া তাহাকে ল্যাং দিয়া ফেলিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে লাগিল। আমি প্রাণপণে দু'জনকে ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "হয়েছে কি ভূতনাথ? গাঁট কাটছিল নাকি লোকটা?"

ভূতনাথ কোন উত্তর দিল না—মারামারি করার সময় সে কথা কয় না—খালি একটা চাপা আওয়াজ করিতে থাকে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে —'গাঁট কেটেছে, মারো গাঁটকাটাকে" বলিয়া একটা রব উঠিল। বুঝা গেল লোকগুলার মারামারির কারণ সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। তবে দুইজনের মধ্যে কে গাঁটকাটা সে সম্বন্ধেও কোন ধারণা তাহাদের না থাকায়—ভূতনাথই যে নিরাপদ একথাও বলা চলে না। রঙ্গী আমাদের দিকে পিছন করিয়া লাঠির দুই প্রান্ত ধরিয়া নিজের উপর তুলিয়া হুংকার ছাড়িতেছিল, "চলে এসো, কে দা'ঠাকুরের গায়ে হাত দেবে, ব্যোম হর হর!..."

ভিড়টা অগ্রসরও হইতে পারিতেছে না, অথচ গাঁটকাটাকে উত্তম-মধ্যম

দেওয়ার লোভটাও ক্রমেই দুর্দমনীয় হইয়া উঠিতেছে। এ-অবস্থায় কি যে হইত বলা যায় না; কিন্তু ঠিক এই সময় দুই দিক হইতে দুইখানা গাড়ি আসিয়া পড়ায় মুহূর্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের পরিবর্তন আসিয়া গেল। ভিড়ের সবাই প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটিল। রঙ্গী লাঠি নামাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। লোকটা ল্যাং মারিবার চেষ্টা বন্ধ করিয়া, একটা ঝাঁকানি দিয়া ভূতনাথের হাতে বাবরীর কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া পলাইল। ভূতনাথকে একরকম টানিতে টানিতে ছুটিলাম।

গাড়িতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছিল? তুই হতভাগা ওখানে গিয়ে পৌঁছুলি কি করে?···দেখি; একি, চোখের ওপরে যে কালসিটে পড়ে গেছে!"

রঙ্গী বলি, "জামাটা যে পিঠের কাছে ছিঁড়ে গেছে, দা'ঠাকুর! আর তোমার গায়ে একটা চাদর ছিল না রেশমী? সেটা দেখছি না তো!"

আমি আর বিরক্তি চাপিতে পারিলাম না, বলিলাম, "এই কাপড়টাও নিক্ কেউ কেড়ে, দিগম্বর হয়ে শ্বশুরবাড়ি যা!·· ওখানে তুই মারামারি করতে গেলি কি করে?"

ভূতনাথ বোধ হয় একটু অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিল। গাড়ির চারিদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে-ব্যাটা এ গাড়িতে ওঠে নি, না? ···আমার কি দোষ?—যখন দেখলাম তোর বড্ড দেরি হচ্ছে,—মনে করলাম নিশ্চয় মারামারি বেঁধে গেছে—তোকে একলা পেয়ে ঠেঙাচ্ছে জেনে ভয়ংকর রাগ হ'ল। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তোকে টেনে বের করে আনব—কোনমতেই ঢুকতে দেবে না। তখন আমার ভয়ংকর রাগ বেড়ে গেল—আর সামলাতে পারলাম না। ঠেলে গোঁত্তা মেরে ওদের পায়ের মধ্যে দিয়ে ঢুকতেই সেই ব্যাটা দু'টো উরুর মধ্যে আমায় চেপে ধরলে। তখন রাগ হয় না?—বল্?"

বলিলাম, "হয় ; কিন্তু তার আগে আমায় বল্ দিকিন—আমি মারামারি করছি, একলা পড়ে মার খাচ্ছি—এসব খবর তোকে কে দিলে? আর তুই যে গোঁত্তা মেরে ভেতরে ঢুকতে গেলি, আমি সেখানে আছি কিনা সেটা আগে বুঝে নিয়েছিলি ?···"

ভূতনাথও এবার চটিল, বলিল, "হ্যাঁ, আমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুঝি, আর ওদিকে তোকে চেপে দম বন্ধ করে মেরে ফেলুক !"

বলিলাম, "আমি যে তার ঢের আগে টিকিট কেটে চলে এসেছি ; আমি মোটে নেই সেখানে, আর আমায় চেপে মারবে ?"

ভূতনাথ ঝাঁঝিয়া উত্তর করিল, "আর নেই, তা কি আমি জানি—খালি এক কথা নিয়ে বকর বকর !"

তর্ক করাও বৃথা; আমি চুপ করিয়া গেলাম। গাড়িটা ছাড়িয়া দিয়াছিল প্রায় আমাদের ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই। ভূতনাথ জানালা দিয়া মুখটা একটু বাহির করিয়া বসিয়া রহিল। মাঝে মাঝে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম, তাহার রগের কাছের ফুলাটা দ্রুত বাড়িয়া উঠিয়া চোখের কোণটা ঢাকিয়া দিতেছে। পাঞ্জাবিটা ছেঁড়া, চাদর নাই,—এ অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি লইয়া যাওয়া যায় কি করিয়া? গাড়ি ছাড়িবার পূর্বে টের পাইলে ফিরিয়া যাইতাম, কিন্তু এখন তো উপায় নাই। চাদর একটা আমার গায়ে ছিল। সেটা না-হয় দিলাম ; কিন্তু জামা? কপালের কালসিটে ?···তাহা ভিন্ন যাত্রাটা অশুভ হইয়া গেল দেখিয়া মনটাও বড় ক্ষুন্ন হইয়া রহিল।

পরের স্টেশন রিষড়ায় গাড়ি থামিলে রঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল, "একবার না হয় নেবে দেখব, সে লোকটা কোন্ গাড়িতে আছে ?"

ভূতনাথ সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ভিতরে টানিয়া লইয়া উৎসাহের সহিত বলিল, "হ্যাঁ, দেখ্না রঙ্গী।"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ?"

রঙ্গী উত্তর করিল, "চাদরটা যদি পাওয়া যেত⋯"

ভাবিয়া দেখিলাম সেটা সম্ভব বটে। বলিলাম, "দেখ্, কিন্তু বেশি দূর যাসনি যেন।"

ভূতনাথ আঙ্গুল দিয়া কপালের ফুলাটার মাপ লইতে লইতে বলিল, "যদি দেখতে পাস তাকে রঙ্গী, তো আমায় ডেকে নিস্ ?"

একটু ধমকের সুরেই প্রশ্ন করিলাম, "কেন শুনি ?"

ঠিক এই সময় হুইস্‌ল্ দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দেওয়ায় আপাতত ও সমস্যাটা মিটিয়া গেল। গাড়ি একটু অগ্রসর হইলে দেখিলাম সমস্যাটা একেবারে তিরোহিত হইতেছে।—সেই লোকটি, মাথায় উস্কখুস্ক বাবরি পাঞ্জাবির বাঁ হাতের আস্তিনটা অর্ধেক ছেঁড়া, কোমরে ভূতনাথের সিল্কের চাদর জড়ানো। বোধ হয় গাড়ি ছাড়ার পর নামিয়াছে। এখন অপস্রয়মান গাড়ির দিকে সন্তর্পণে আড় চোখে চাহিতে চাহিতে গেটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভূতনাথের মুখটা উল্টা দিকে ছিল, আর একটু অগ্রসর হইলে তাহারও চোখে পড়িবে; মুহূর্তের জন্য দ্বিধা —চাদরের মায়া—লোকটাকে ধরিয়া দিবার লোভ; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেটা কাটাইয়া উঠিয়া বলিলাল, "ভূতনাথ, এদিকে দেখ্।"

ভূতনাথ গাড়ির ভিতরের দিকে মুখটা ঘুরাইয়া লইল। প্রশ্ন করিল, "কি রে ?"

কি সেটা অত তাড়াতাড়ি ঠিক করিতে পারি নাই। হঠাৎ গাড়ির ও কোণটায় নজর পড়িল। কয়েকজন পশ্চিমা বোধ হয় দেশ হইতে আসিতেছে। ঝুড়ি, লাঠি, বাক্স, প্যাঁটরা, বাঁটলো, বালতি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে ওদিককার দুখানা বেঞ্চের মাঝখানের জায়গাটা এমন ভর্তি হইয়া গিয়াছে যে, শেষের বেঞ্চটা আর দেখাই যায় না। দেখাইয়া হাসিয়া বলিলাম, "কাণ্ডখানা দেখ্!"

এমন কিছু দ্রষ্টব্য নয়, তাহা ভিন্ন ভূতনাথ বড় অন্যমনস্কও ছিল; 'হুঁ'

বলিয়া আবার মুখ ফিরাইয়া লইল; ততক্ষণে বিপদ কাটিয়া গিয়াছে।

আমি কিন্তু সম্মোহিতের মতো প্রায় সেই গাঁটগাঁঠরির পাহাড়টার দিকে চাহিয়া রহিলাম। ক্রমে একটি চমৎকার প্ল্যান আমার মাথায় একটু একটু করিয়া জমিয়া উঠিতে লাগিল। অবজ্ঞা করিয়া যেটার দিকে চাহিতাছিলাম, তাহা হইতেই এই দারুণ সংকটে আমার পরিত্রাণ। কোন্নগর পার হইয়া গেল, উত্তরপাড়াতেও ধরিবে না। পশ্চিমের গাড়ি, বালিতে গিয়া একেবারে দাঁড়াইবে, কুলি নামাইবার জন্য। আমি মন স্থির করিয়া লইলাম।

গাড়ির অপর প্রান্তে পশ্চিমাদের জমায়েৎ হইতে একটা ধুঁয়ার কুণ্ডলি উঠিয়া শিবদেহলগ্ন সর্পের মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া দলটার গায়ে লতাইয়া পড়িতেছিল; রঙ্গী সেই দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। আমি তাহার দিকে চাহিতে বলিল, "ধোঁয়ার রং দেখুন একবার, দা'ঠাকুর—খাঁটি জিনিস!"

আমি মুখটা তাহার দিকে ঝুঁকাইয়া আস্তে আস্তে বলিলাম, "হ্যাঁ, দেখ রংলাল, আমি একটা কথা ভাবছিলাম,—গায়ে চাদর নেই, জামা ছিঁড়ে গেছে, বাঁ চোখটা তো দেখছই—প্রায় বুজে এলো; এ-অবস্থায় কি ভূতনাথের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া উচিত?"

রঙ্গী দোমনা হইয়া একটু চুপ করিয়া রহিল। আমি তাহার দ্বিধাটুকু কাটাইয়া দিবার জন্য বলিলাম, "আর কিছু নয়, আমি শুধু ভাবছি, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ভাববে সঙ্গে রংলালের মত জোয়ান, তা'সত্ত্বেও জামাই কিনা…"

রংলাল হাত চিতাইয়া, গোঁফ ফুলাইয়া চোখ দুইটা বড় করিয়া বলিল, "আমার কি দোষ দা'ঠাকুর, লাঠি দেখে এগুল না যে কোন ব্যাটা…"

আমি বলিলাম, "একটু আস্তে বল রংলাল।"

রংলাল বলিল, "লাঠি দেখে কোন স্মুন্দি এগুলো না, নৈলে…"

বলিলাম, "সে তো ঠিক, কিন্তু তারা তো কেউ বুঝবে না।…তাই আমি ভাবছিলাম—চল, না হয়, এ যাত্রা ফিরেই যাওয়া যাক। তোমার লাঠিটা কাড়তে দেরি হ'ল, তাই না?—যদি নিজের লাঠিটা হাতে থাকে—থাকতো যদি—তো একেবারে তাই শুদ্ধু তাদের ঘাড়ে পড়লে…"

রংলাল উল্লসিতভাবে গোঁফ এবং চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "তা ঠিক বলেছ, দা'ঠাকুর! ফিরে গিয়ে বরং লাঠিটাকে ভাল করে তেল খাওয়াই দিনকতক।"

লাঠিটা তুলিয়া তাহার ভার পরীক্ষা করিয়া বলিল, "পশ্চিমের জিনিস—যেন লোহা গো!'

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হইয়া বলিল, "কিন্তু তানারা যে সব ইস্টিশানে আসবে, দা'ঠাকুর; ফিরতে দেবে কেন?—জামা ছোঁড়া হোক্, কি একটা চোখ বুজেই যাক্—জামাই তো?"

"সে ব্যবস্থা আমার হাতে। ওই মোটমাটের পাহাড় দেখছ তো?"

রংলাল দেখিয়া বিমূঢ়ভাবে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, দেখছি।"

"শেষের বেঞ্চটা একেবারে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বলি—স্টেশন আসবার আগেই—তোমরা দু'জনে ওদিকে গিয়ে চুপটি মেরে পড়ে থাকো। আমায় কেউ চেনে না। বালিটা পেরিয়ে গেলে উঠে আসবে। তারপর লিলুয়া থেকে ফিরে আসা যাবে।"

রঙ্গী বিপুল হর্ষ, বিস্ময় এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে খানিকটা আমার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর আস্তে আস্তে বলিল, "তুমি দা'ঠাকুর হাইকোর্টের জজ হবে—কী মাথা গো!"

গাড়ির আওয়াজে আমাদের কথা যদি শোনাই যাইতেছিল তো

নিশ্চয় নিতান্ত অসংলগ্নভাবে। ভূতনাথ সেই একভাবে বসিয়া কি ভাবিতেছিল জানি না, হঠাৎ ঘুরিয়া প্রশ্ন করিল, "কার মাথার কথার বলছিস্ রে রঙ্গী—দেখ্ না একবার লোকটাকে গাড়িটা থামলে।"

আমি বলিলাম, "তাকে যেন মনে হ'ল রিষড়েয় নামতে দেখলাম, ভূতনাথ; তাই বলছিলাম, আজ আর তোর শ্বশুরবাড়ি না গিয়ে যদি রিষড়েয় গিয়ে লোকটার খোঁজ করা যায় তো একটা কাজ হয়···কি বল হে রঙ্গী?"

রঙ্গী কোন উত্তর করিল না। বিপুলতর বিস্ময় এবং প্রশংসার দৃষ্টি আমার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া হাঁ করিয়া রহিল। বোধ হয় হাইকোর্টের জজিয়তির উপরও কোন পদ আছে কি না সেটা তাহার মাথায় আসিতেছিল না।

ভূতনাথ প্রায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "তাহ'লে তো খুবই ভালো হয়!"

তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলাম, "বোস্। তা'হলে কিন্তু এক কাজ করতে হয়। স্টেশনে তোকে আবার নিতে আসবে কি না, তারা তো দেখতে পেলে আর ছাড়বে না···"

ভূতনাথ আগ্রহের সহিত বলিল, "গাড়ি থামতে থামতেই ওদিক দিয়ে লাফিয়ে সরে পড়ব?"

আমি ভীতভাবে তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না—না, তা করতে হবে না। আমি বলছিলাম, তোতে আর রঙ্গীতে ওই মোটমাটগুলোর আড়ালে শেষের বেঞ্চে গিয়ে একটু লুকিয়ে থাকবি, তারপর···"

ভূতনাথ একটু সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "লুকোব কার ভয়ে?"

উত্তরপাড়া ছাড়িয়া গিয়াছিল, গাড়ির গতি একটু একটু মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। আমি বলিলাম "ভয়ে নয়, মানে হচ্ছে—তোকে দেখলে তো আর···"

ভূতনাথ একটু দমিয়া গেল যেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন উৎসাহিত হইয়া বলিল, "আর ওরা যদি বসতে না দেয় ?"

তখনও অতটা বুঝি নাই, বলিলাম, "দেবে নিশ্চয়, দেবে না কেন ?"

রঙ্গী গোঁফটা ফুলাইয়া বলিল "ওদের বাপের কেনা গাড়ি ?"

তখনও বোঝা উচিত ছিল ওদের দু'জনের ভাবটা। ভূতনাথের চোখ দুইটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গাড়ির বেগটা আরও কমিয়া আসিয়াছে। ভূতনাথ দাঁতে দাঁত ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "যদি বসতে না দেয় তো···ওঠ্ তো রঙ্গে···"

আমি বাধা দিবার আগেই মাড়াইয়া, ফেলিয়া, টপকাইয়া, দুজনে নিমিষের মধ্যে ওদিকে গিয়া পড়িল, ভাবটা স্পষ্টতই আক্রমণের। সব পশ্চিমাগুলাই একজোটে দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল, "কেয়া হ্যায় ?"

ভূতনাথ আর রঙ্গী একসঙ্গে উত্তর করিল, "ঢুকায় গা।"

পশ্চিমারা সব মুখ এক জায়গায় জড় করিয়া সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ক্রোধবিকৃত স্বরে প্রশ্ন করিল, "কেয়া থায় গা ?···"

"এই থায় গা !"—ভূতনাথের ঘুঁসি তীরের মতো সোজা গিয়া একজনের একেবারে নাকের নিচে জমিয়া বসিল। তাহার পর আর মুখের কথা নয়—খালি চটাপট, চটাস্ চটাস্ শব্দ। গাঁঠরি ছিঁড়িয়া গড়াইয়া পড়িতেছে—চেঙারিগুলো ঢালের কাজ করিতে করিতে তুবড়াইয়া ভাঙিয়া গেল, কলকে ভাঙিল, হুঁকা ছুটিল, মেয়েরা কাঁদিয়া উঠিল, বাচ্চাগুলা আর্তনাদ করিয়া উঠিল।—এক রকমারি ব্যাপার !

ইতিমধ্যে গাড়ি আসিয়া বালিতে থামিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের গাড়িটার সামনে প্ল্যাটফর্মের উপর ভিড় জমিয়া গেল। আমি সাধ্যমত থামাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময় উদ্বিগ্নকণ্ঠের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, "ওহে এদিকে এসো, মারামারি হচ্ছে—নিশ্চয় এই গাড়িতে আছে···"

স্বরটা যেন চিনিতেও পারিলাম। সেই আন্দাজেই বিপন্নভাবে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এই গাড়িতেই, শীগগির আসুন, আর সামলাতে পারছি না।"

আওয়াজ করিতে করিতে ভিড় ঠেলিয়া একটি ছোট দল অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দরজা ঠেলিয়া গাড়ির ভিড় সরাইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, —ভূতনাথের শ্বশুর, খুড়শ্বশুর, বড় শালা, আরও দু'জনকে চিনি না।

মারামারিটা থামিয়া গেল। গর্জন, ফোঁসফোঁসানি, ভিড়ের আলোচনা লাগিয়া রহিয়াছে। ভূতনাথের শ্বশুর বলিলেন, "জামাই কোথায়? হয়েছে কি?"

বিজয় অভিযানে জমি দখল করিতে করিতে ভূতনাথ অনেকটা ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল। টানিয়া আনিয়া সামনে দাঁড় করাইয়া বলিলাম, "নে, প্রণাম কর্!"

—বাঁ চোখটা একেবারে বুজিয়া গিয়াছে, ডান চোখটা একটু লজ্জিত যেন, উপর ঠোঁটের ডান দিকটা অত্যন্ত স্ফীত—যেন নাকটা বাঁকিয়া নামিয়া আসিয়াছে—শরীরে যতটা দৃষ্টিগোচর হয়, রাঙা আর কালো দাগে ভরা।

আর শরীরের দৃষ্টিগোচর হওয়ার মধ্যে বাকিও পড়িতেছে খুব অল্পই। জামা, গেঞ্জি একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কাপড় খুবই সংক্ষিপ্ত—তাহার বর্ণনাটাও সংক্ষিপ্ত রাখাই ভালো।

মুষ্টি-যোদ্ধা বিজয়ী বীরের মতো ভূতনাথ অল্প একটু বিকৃত হাস্যের সঙ্গে একবার শ্বশুরের মুখের দিকে লজ্জিত-ভাবে চাহিল; তাহার পর নত হইয়া পায়ের ধূলা লইল।

[আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৪]

অতঃ কিম্

মিশনের খুব বড় একজন ব্রহ্মচারী ; নাম করিলে সবাই চিনিবেন, কিন্তু যা কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি সেটা আর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিলাম না।

মঠে কয়েকবার যাওয়া-আসায় একটু হৃদ্যতা জন্মিয়াছে। প্রচুর স্নেহ করেন, প্রায় চিঠিপত্র দিয়া থাকেন। শেষ চিঠি দিয়াছেন মেদিনীপুর থেকে, —প্লাবন এবং তজ্জনিত নিদারুণ দুঃখকষ্টের কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া সাহায্য চাহিয়াছেন, অর্থ দিয়া, এবং সম্ভব হয়তো মানুষ দিয়াও।

খুবই দুর্ভাবনায় পড়িয়াছি। বাবাজী এত দিন জ্ঞানযোগ আর ভক্তি-যোগ লইয়া পত্রাচার চালাইতেন, এদিকে ওদিক থেকে জোগাড় করিয়া উত্তর দিয়া ঠাট বজায় রাখিয়া আসিতেছিলাম। বেশ চলিতেছিল নির্বিবাদে ; হঠাৎ এ রকম কর্মযোগের নমুনা হাজির করিয়া সব যেন ভণ্ডুল করিয়া দিলেন।

যাই হোক, কিছু করিতে তো হইবে, এখন আর উপায় কি ? ওঁর অন্য এক ভক্তকে দেখাইলাম চিঠিটা। অনাথ।—বাবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় নাই, আমায় লেখা পূর্বেকার চিঠি সব পড়িয়াই ওঁর অনুগত শিষ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই চিঠিটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া এমন ভাবে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না ; বলিল, "লোকটার আবার এসব বাই-ও আছে নাকি ?···তুই সন্নিসী-ফকির মানুষ, তোর এসব সংসারের কথায় থাকা কেন বাপু ! হ্যাঁ যাদের ঘর পড়েছে, বৌ-ছেলে মরেছে, তাদের মধ্যে এই মোওকায় বৈরাগ্য ঢুকিয়ে কেত্তনে মাতাতে পারতিস্, বুঝতুম সন্নিসীর যুগ্যি একটা কাজ হচ্ছে।···যত সব বোগাস্, এত দিনে আসল রূপ খুলল !"

বলিলাম—চাঁদা আদায় করিতে সাহায্য না করুক, নিজে কিছু দিক্ না হয়। অনাথ হাতযোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল, আবার হাত দুইটা বিযুক্ত করিয়া সবেগে নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "না ভাই, মাফ করতে হচ্ছে ; দিতে হয় অন্য রাস্তা আছে ; বড্ড ধোঁকা খেলাম আজকে। ঐ লোকই আবার জ্ঞানযোগ নিয়ে পাঁচ পাতার চিঠি লিখতে আসে ;—খুব ভিড়িয়ে দিয়েছিলে যাহোক !"

একটা দিন খুব দুশ্চিন্তা আর অশান্তিতে কাটিল। মনের ভাবটা আমারও অনাথেরই মতো কিন্তু ওর মতো একেবারে গা-ঝাড়া দিতে কোথায় যেন বাধিতেছে। অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে গোবরার কথা মনে পড়িল। গোবরা এসব ব্যাপারে যাকে বলে—'দী ম্যান্,' মনে পড়ে নাই, তাহার কারণ নীতি, ধর্ম—এ সবে বিশ্বাস নাই বলিয়া হতভাগাটা ঠিক আমাদের সার্কেল অর্থাৎ গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না—ভলন্টিয়ারি, থিয়েটার, ফুটবল, নেমন্তন্নে পরিবেশনে, চাঁদা আদায় এই সব লইয়া থাকে ;—ভলন্টিয়ারির হুইস্‌ল্‌টা দামী হইলে আর ফেরত দেয় না, পরিবেশন করিবার আগে যে জিনিসটা কম তার একটা মোটা অংশ নিজেদের জন্য নিরাপদ স্থানে সরাইয়া রাখে—এতে ন্যায়ধর্মের দিক দিয়া যে কি ইতরবিশেষ হইল খোঁজ রাখে না। আরও সব আছে।

কিন্তু কাজের ছোকরা, আর চাঁদা তোলায় অদ্ভুত প্রতিভা! উহারই শরণাপন্ন হইলাম। চিঠিটা পড়িলাম—যতটা সম্ভব আরও মর্মস্পর্শী করিয়া, নিজেও ছোটখাট একটি বক্তৃতা দিলাম, তাহার পর বলিলাম, "তোমাকে একটু ব্যবস্থা করে দিতেই হবে গোবর্ধন।"

গোবরা দাঁতে তর্জনীর নখ খুঁটিতে খুঁটিতে সবটা শুনিল, ঠোঁট দুইটা কুঞ্চিত করিয়া ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, অতিশয় শক্ত।"

বলিলাম, "শক্ত হোক্, অসম্ভব তো নয়? বিশেষ করে তোমার কাছে···"

গোবরা বলিল, "অসম্ভবের চেয়ে শক্ত। কোথায় টাকা পাবে শৈল-দা লোকে? এইটুকু শহরে দু-দুটো সিনেমা চলছে, হপ্তায় অন্তত একটা করে শো না দেখলে সমাজে বসে দুটো কথা কইতে পারে না ভদ্দরলোকে, কেমন যেন একঘরে হয়ে পড়ে।...তারপর এই মাগ্যিগণ্ডা, কোথা থেকে পাবে লোকে বলো? খাতা নিয়ে যে হাজির হব—একটু আক্কেল করতে হবে তো?"

আমি আবার চাপিয়া ধরিতে যাইতেছিলাম, গোবরা বলিল, "তবুও একটু চেষ্টা করলে যে একেবারে কিছু না হয় এমন নয়। একটা মতলবও ঠাউরেছিলাম, কিন্তু...না দাদা থাক্, যা জাঁদরেল ব্রহ্মচারী মাঝখানে রয়েছে দেখছি..."

আমি ওর হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, "কি মতলব করেছ বলো, কিছু টাকা তুলতেই হবে; শুনলে তো, উনি নিজেই আসবেন লিখেছেন, দাঁড়িয়ে অপ্রস্তুত হ'তে হবে—তুমি থাকতেও! আর ব্রহ্মচারীর কথা বলছ, সে তো ভালোই আরও, অপব্যয়ের কোন কথাই থাকবে না। হেঁজিপেঁজি নাগাফকির নয় যে বলবে,—যেমন জ্ঞানী, তেমনি কর্মী; আসছেন তো, দুটো কথা কইলেই বুঝতে পারবে।

গোবরা বলিল, "চলবে না শৈল-দা, নাগা-সন্নিসী হ'লে তো ভাবনাই ছিল না; এ বোধ হয় মাথা ঘামিয়ে খেটেখুটে একটা জিনিস খাড়া করলাম, —কবে রামকৃষ্ণ কি বিবেকানন্দ কি বলেছেন সেই কথা তুলে সব পণ্ড করে দিলে। মেহনৎই সার হ'ল, উল্টে জোচ্চোর বলে বদনাম; মাফ করো শৈল-দা।"

আমি বলিলাম, "সে ভার আমি নিচ্ছি, তুমি যা করবে তার মধ্যে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না।"

গোবরা তর্জনীটা একটু তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখ, পাকা কথা তো? শেষকালে সব করে-কর্মে না ভেস্তে যায়!"

একটু থতমত খাইয়া যাইতে হইল, আমতা-আমতা করিয়া বলিলাম, "তুমি তো আর চুরিও করছ না, ডাকাতিও করছ না···"

"আর গেরুয়াধারী যদি বলেন, এর চেয়ে চুরি কিংবা ডাকাতি ঢের ভালো ছিল, তা হ'লে ?"

আমার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

এমন কি উৎকট মতলব ঠাওরাইয়াছে গোবরা ?– একটু মাথা চুলকাইতে হইল, তাহার পর বলিলাম, "ওঁকে কিছু জানতে দেওয়া হবে না, তুমি নেমে পড়ো গোবর্ধন। একটু ভালো করেই চেষ্টা কোরো ভাই।"

দু-দিন পরে গোবরা নিজেই আসিয়া হাজির হইল, হাতে সবুজ কাগজে ছাপা একতাড়া হ্যাণ্ডবিল্, একখানা আমার পানে বাড়াইয়া বলিল, "এই নাও, পড়ে দেখ।"

আমি যতক্ষণ পড়িতেছি, বলিতে লাগিল—"অন্য রকম চেষ্টাও যে না করেছি এমন নয়; বাবাজী রয়েছেন, ভাবলাম ধর্মের পথেই যাওয়া যাক্,—আবার এদিকে পরকাল আছে তো? প্রথমে যুগ্‌লোকে ধরলাম—'একটা ফুটবল চ্যারিটি দে।' বললে—'আমাদের আর সে দিন নেই, তা ভিন্ন ওয়ার-ফণ্ডের জন্যে দু-বছরে পাঁচ-পাঁচটা চারিটি দাঁড় করাতে হয়েছে; বেটারা টাকা দিয়ে যেন মাথা কেনে, একটা যদি গোল খেলাম, কি একটা যদি মিস্ করলাম তো খেলবো কি,. গালাগালির চোটে মাথার ঠিক থাকে না। কে ও হাঙ্গামের মধ্যে যায় ভাই ?' গেলাম বিমলের কাছে—বললাম, 'একটা চ্যারিটি পারফরমেন্স্ দে বিমল, টিকিট বিক্রির ভারটা আমি নিচ্ছি।' বললে—'এত তাড়াতাড়ি রিয়ার্সেল দিয়ে একটা নতুন খাড়া করা করা চলে না তো? দিতে হ'লে এক চন্দ্রগুপ্ত দিতে হয়, তোয়ের আছে,—তা সেলুকাস,

ছায়া, দুজনের মধ্যে কেউ নেই—আপিস খুলেছে, তারা চলে গেছে।' তখন নিরুপায় হয়ে এই মতলবই করতে হ'ল ; পড়লে ?"

ওর প্ল্যানে হাত দিতে যাইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, মনের রাগটা মনেই চাপিয়া ঈষৎ হাসিমুখেই হ্যাণ্ডবিলটা ফেরত দিলাম। গোবরা বলিল, আমার আবার সাহিত্য-টাহিত্য আসে না, পাঁচটা দেখে একটা দাঁড় করালাম, পড়লে তো, একবার আমার মুখে শুনে দেখ দিকিন—চটকদার হ'ল কি না—"

হ্যাণ্ডবিলটা একটু তফাতে ধরিয়া পড়িতে লাগিল—

"অতঃ কিম্ ? অতঃ কিম্ ?? অতঃ কিম্ ???

আজ নিরবচ্ছিন্নভাবে যে বিরাট্ প্রশ্ন ছায়াচিত্রাকারে স্থানীয় 'অলকা টকিজে' দুই মাস ধরিয়া রূপায়িত হইয়া আসিতেছে, তাহার অর্থ আপনারা সকলেই জানেন—"অতঃ কিম্ ?" অর্থাৎ, "ইহার পর কি ?" কিন্তু এই ছায়ারূপ দেখিয়া আপনারা বিস্মিত, রোমাঞ্চিত, বিলোল-কটাক্ষ হইলেও কখন কি এই বিরাট্ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছেন ?"...

যাহা করিয়াছে তাহার ক্ষোভটা ভাষার খুঁৎ ধরিয়াই মিটাইলাম, প্রশ্ন করিলাম, "বিলোল-কটাক্ষ কেন লিখেছ ?"

গোবরা উত্তর করিল, "আশ্চর্য হয়ে চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে।"

বলিলাম, "ওর মানে তা নয়—মানে হচ্ছে মেয়েছেলেদের টানা টানা চোখের দৃষ্টিপাত।"

গোবরা একটু অপ্রতিভের মতো হইয়া গেল, বলিল, "অলকা টকিজের হ্যাণ্ডবিলে পেলাম কথাটা। তা অল্পই তফাৎ, কেউ ধরতে পারবে না। তা ভিন্ন কথাটার মধ্যে বেশ..."

গোবরা দাঁতে দাঁতে পিষিয়া বলিল, "কথাটার মধ্যে বেশ একটা ইয়ে আছে।"

ওকে চটানোও ঠিক নয় আবার, বলিলাম, "হ্যাঁ, তা আছে, আমেরিকান্‌রা যাকে বলে zip ; পড়ো।"

গোবরা পড়িয়া যাইতে লাগিল—"কখনও কি এই বিরাট প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছেন? না, পারেন নাই, উগ্র কৌতুক উদ্দীপনা বুকে লইয়া প্রত্যহ বাড়ি আসিয়াছেন, এর পর কি আছে জানিবার জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু উত্তর পান নাই। কিন্তু উত্তর কি চান না? উত্তরের জন্য কি কোন ব্যাকুলতা নাই? তাহা হইলে—

আসুন! আসুন!! আসুন!!!

আপনাদের কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য সশরীরে শুভাগমন করিতেছেন—

কে? কবে?? কোথায়???

বর্তমান বাংলার চিত্রাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, বর্তমান বাংলার চিত্তাকাশে দীপ্ততম তারকা, আপনাদের চির আদরের সাহানা দেবী—নায়িকার ভূমিকায় যাঁর অপূর্ব অভিনয়ে "অতঃ কিম্" আজ চিত্র-জগতের শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া প্রতিপন্ন, যাঁর অলৌকিক লাবণ্য আর অপ্সরোচিত লাস্যবিলাসে 'অলকা'র রূপালী পর্দা আজ দুই মাস ধরিয়া ঝলমল করিতেছে—তিনি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বয়ং আসিয়া 'অতঃ কিম্,' সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন।

"সাহানা দেবী! মঙ্গলবার ৩রা নভেম্বর!! স্থানীয় টাউন হলে!!!

"যাঁহাকে ছায়ায় দেখিয়া মুগ্ধ, বিস্মিত হইয়াছেন তাঁহাকে কায়ায় দেখিয়া স্তম্ভিত, নির্বাক হউন, তাঁহার অলৌকিক সংগীত এবং পারলৌকিক নৃত্য দেখিয়া..."

অসাবধানতাবশত প্রায় হাসিয়া ফেলিয়াছিলাম, সামলাইয়া লইলাম।

গোবরা বলিল, "অলৌকিকের সঙ্গে জোড়া মিলিয়ে ঐ কথাটা বাইরে থেকে এনে বসিয়ে দিলাম, মানেটা কিন্তু ঠিক জানা নেই...ওসব নিয়ে তো আর মাথা ঘামালুম না কখনও।"

বলিলাম, "পরলোক থেকে হয়েছে আর কি।"

গোবরা আবার একটু অপ্রতিভভাবে আমার পানে চাহিল, বলিল, "'ভূতের নেত্য' মানে করে বসবে না তো বেটারা? যা বাংলার বিদ্যে সব!"

বলিলাম, "আবদার নাকি?—অলৌকিক মানে করবে এক রকম, আর পারলৌকিক মানে করবে অন্য রকম? একই কথা তো, সাজ আলাদা শুধু, তুমি পড়ো।"

গোবরা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "করুক গে, টাকা দিলেই হ'ল, কি বলো?"

আবার পড়িতে আরম্ভ করিল—"তাঁহার অলৌকিক সংগীত এবং পারলৌকিক নৃত্য দেখিয়া···পারলৌকিক নৃত্য দেখিয়া···"

কথাটাকে যেন বেশ করিয়া পরখ করিয়া লইল, বলিল, "না, ঠিক আছে।"

আবার পড়িতে লাগিল—"পারলৌকিক নৃত্য দেখিয়া জীবন ধন্য করুন। নৃত্যগীতের পর সাহানা দেবী 'অতঃ কিম্'-এর বিস্ময়কর পরিণতি সম্বন্ধে আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন।

"আসুন! সপরিবারে সবান্ধবে আসুন!! এ স্বর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না!!!

প্রবেশ মূল্য—

রিজার্ভ ৫৲ প্রথম শ্রেণী ৩৲ দ্বিতীয় শ্রেণী ২৲

তৃতীয় শ্রেণী ১৲ গেলারি ॥৹

"যদি নিরাশ হইতে না চাহেন তবে পূর্বাহ্ণেই টিকিট সংগ্রহ করিয়া রাখুন। আসনের সংখ্যা একেবারে নির্দিষ্ট।"

"বিক্রয়লব্ধ অর্থ সাহানা দেবী বন্যা-দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের জন্য ব্যয়িত করিতে সংকল্প করিয়াছেন।"

পড়া শেষ করিয়া গোবরা বলিল, "এটা নিয়ে আর বেশি লিখলাম না, অনেকে ভড়কে যেতে পারে, ভাববে—ধান ভানতে শিবের গীত এনে ফেলে কেন রে বাবা ?

পড়া হইয়া গেলে আমি প্রশ্ন করিলাম, "এ নয় বুঝলাম, কিন্তু ওকে ঠিক করলে তুমি কোথা থেকে ?"

গোবরা হাতজোড় করিয়া বলিল, "মাপ করো শৈল-দা, ওটি ট্রেড সিক্রেট, বলতে পারব না। তা ভিন্ন অন্য সবাইকে কি বলছি না বলছি তাতেও কান দিও না।"

হ্যাণ্ডবিল বিলি করিয়া, দেওয়ালে, গাছে, ল্যাম্পপোস্টে পোস্টার সাঁটিয়া দুই দিনেই গোবরা সহরে একটা সাড়া জাগাইয়া দিল। তিন দিন তাহার দেখা পাইলাম না। চতুর্থ দিন বেশ একটু গা-ঢাকা গোছের হইয়াছে, গোবরা আসিয়া উপস্থিত হইল। একা ছিলাম না, চার-পাঁচ জনে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। গোবরা দেখিয়াই প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেল; অবশ্য সেটা আমিই বুঝিলাম, আর কেহ বোধ হয় বিশেষ লক্ষ্য করিল না; একটা খালি চেয়ার দখল করিয়া বসিল। বলিল, "তোমার কাছে একবার এলাম শৈল-দা, একটু উপুড়-হস্ত করতে হবে।"

আমি কিছু বলিবার পূর্বেই গোবরা সুরু করিয়া দিল, "মানে মেদিনীপুরের অবস্থাটা শুনেছ তো ?—জেলাকে জেলা ঝড়ে, সমুদ্রের জলে প্রায় শেষ হয়ে গেছে, সত্ত সত্ত প্রাণে, সম্পত্তিতে যা নষ্ট হয়েছে, তা তো হয়েছেই, বালি আর সমুদ্রের লোনা জলে ক্ষেত পুকুর সমস্ত বরবাদ করে সমস্ত জেলাটার অবস্থা এমন করে দিয়েছে যে বোধ হয় দশ বছরেও সামলে উঠতে পারবে কি না সন্দেহ।..."

আমি ঠায় ওর মুখের পানে চাহিয়া আছি, বোধ হয় মেদিনীপুরের চেয়েও হতভম্ব হইয়া গেছি। গোবরা বলিয়া চলিয়াছে, "তাই কিছু টাকা

তোলবার জন্যে এই বন্দোবস্তটা করেছি, হ্যাণ্ডবিলটা পড়ে দেখ, তা হ'লেই টের পাবে।···আসতে কি চায়?—একটা স্টার একস্ট্রেস, তার ফুরসৎ কোথায়?···অনেক লেখালেখি করে, নিজে গিয়ে কোন রকমে রাজি করালাম—একটা দিনের জন্য।"

আমার তো একেবারে বাক্‌রোধ হইয়া গেছে; অনিল প্রশ্ন করিল, "ফী কত ঠিক হ'ল?"

গোবরা বলিল, "এক পয়সা নয়। সাহানা দেবীর তো ঐখানেই বিশেষত্ব। আর সেটা জানা ছিল বলেই তো ঘেঁসলাম। এমনিই, যেমন শুনলাম, কলকাতার কোথাও ডান্স্ দিলে ওঁর এক দিনের ফী পাঁচ-শ টাকা, বাইরে সাত-শ থেকে হাজার।"

সকলেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

অনিল বলিল, "শুনেছি এক্‌ট্রেস ভালো নাচতেও পারে নাকি?

গোবরা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন 'অলকা'তে ওঁর শো তো চলেছে, দেখেন নি?—লোক ভেঙে পড়েছে, জায়গা দিতে পারছে না—আজ দু-মাস ধরে এই ব্যাপার।···শুধু নাচ নয় তো, গানেও মার-মার কাট-কাট লাগিয়ে দিয়েছে; ওঁর টাইটেলই হয়ে গেছে নাইটিংগেল্ অফ্ বেঙ্গল।···স্ক্রীনেই এই অবস্থা. আবার যখন সশরীরে স্টেজে নামেন···"

অনিল বলিল, "দেখলে হ'ত একবার, টিকিট তুমিই বেচছ নাকি?"

হরকালী বলিল, "কিছু মনে ক'রো না গোবর্ধন, মেদিনীপুর প্লাবনের জন্যে টাকা তুলতে হবে, তাতে একটা ফিল্ম-একট্রেস এনে ফেলা—এ আমার প্রিন্সিপ্‌লে বাধে যাই হোক, কিছু টাকা পাঠাব পাঠাব করছিলাম, নাহয় তোমার থ্রু দিয়ে যাবে। একবার আমার ওখানে যেও।"

গোবরা ক্ষণিকের জন্য একটু কি যেন ভাবিল, তাহার পর বলিল, "সে আমার সৌভাগ্য হরকালী-দা। টাকাও এসে গেল, টিকিট গুলোও বেঁচে গেল; যে রকম টানাটানি পড়ে গেছে···"

খুব সন্তর্পণে একবার চাহিয়া দেখিলাম—হরকালীর মুখটা যেন শুকাইয়া গেল। সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না, টিকিট—টিকিট—মানে টিকিটগুলো দিয়েই দিও—ফ্রেণ্ডদের মধ্যে কেউ যদি যেতে চায়···ওটা আবার আজকাল একটা ফ্যাশান হয়েছে কিনা···"

বিনোদ বলিল, "যা বলেছ, দেশের লোক মরছে—একটা খণ্ড-প্রলয় —তার জন্যে চাঁদা তুলতে হবে, তার মধ্যেও একট্রেস! কি যে হল কালে কালে!"

গোবরা আবার ক্ষণমাত্র কি ভাবিল, বলিল, "এ রকম কথা শুধু আপনার মুখেই শুনলাম; যা হাওয়া উঠেছে, কি করি বলুন? কিছু টাকা না পাঠালেও নয়, অথচ···। আসব একবার আপনার কাছে এ হাঙ্গামাটা মিটিয়ে নিয়ে। বাড়িতে থাকলে টিকিটের জন্যে তো অতিষ্ঠ করে তুলে চার দিক থেকে সব জুটে, তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি; শো-টা শেষ করেই একবার আসব আপনার ওখানে। মরবার ফুরসৎ নেই বিনোদ-দা।"

বিনোদের পানেও প্রচ্ছন্ন ভাবে চাহিলাম, হরকালীকেও টেক্কা দিয়া বলিতে গিয়াছিল, মুখটা আরও যেন বেশি করিয়া শুকাইয়া গেছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অল্প হাসিয়া বলিল. "তবেই হয়েছে, মাসের গোড়া, হাতে এখন দু-পাঁচটা টাকা আছে, অত ধীরে সুস্থে আসতে গেলে দেখবে ফক্কা। আসতে হয় আজই একবার এস নাহয় কাল সকালে। টিকিটের বইগুলো নিয়েই এস, দেখি পাড়ায় যদি কিছু বিকিয়ে দিতে পারি···সবার তো আর এক প্রিন্সিপ্‌ল্‌ নয়।"

সতীশও প্রিন্সিপ্‌লের কথাই তুলিয়া বাড়িতে ডাকিল। সব শেষে বলিয়া ভানু এমন ভাবে বলিল যেন গীতার ব্যাখ্যা করিতেছে। সমস্ত যুগটাকে গালাগালি দিল, চেতাবনীর কথা তুলিয়া বলিল পয়লা আগস্টে এ যুগ সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত হইয়া না গেলে আর ভদ্রস্থ নাই।

টিকিটের ব্যাপারটা কিন্তু ওদের মতো ভবিষ্যতের জন্য ছাড়িয়া দিল না; মন্তব্য শেষ করিয়া বলিল, "তবু, দাও খান-পাঁচেক টিকিট আমায়, দেখি যদি কাউকে গছাতে পারি – সবার উচিত তো এ সব ব্যাপারে একটু সাহায্য করা।"

গোবরা এত ভালো ভাবে গাঁথিয়াছে যে একটু খেলাইয়া তুলিবার আনন্দ থেকে নিজেকে যেন বঞ্চিত করিতে পারিল না, গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল, "আপনারা যে এতটা ইণ্টারেস্ট নেবেন ভাবতেও পারি নি। কিন্তু কথা হচ্ছে, টিকিট বেচা কি আপনাদের কর্ম? এইখানেই এ রকম উৎসাহ পেলাম, নইলে আমায় যে কী নাকালটাই হতে হয়েছে…"

ভানু বলিল, "না পারি, তুমি আমার কাছ থেকে টাকা নেবে, ঘাড়ে করে যখন নিচ্ছি ··কাল সকালে এসো একবার!"

অনিলের অবস্থাটা দেখিলাম একটু শোচনীয়, এই সব বড় বড় তত্ত্ববাগীশদের মধ্যে সোজাসুজি ভাবে একট্রেস সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখাইয়া বড় যেন খাট হইয়া পড়িয়াছে। তবে সে দমিবার পাত্র নয়, এই সব কথাবার্তার মধ্যে নিজের মতলব আঁটিতেছিল, ভানু থামিলে গোবরাকে বলিল, "যাক্, তা'হলে আমার আর টিকিট কেনবার দরকার হবে না।"

সকলেই বিস্মিতভাবে তাহার পানে চাহিলাম, গোবরা প্রশ্ন করিল, "সে কি অনিল-দা, তার মানে?"

অনিল বলিল, "আমার ভাই নাচই দেখবার একটু ইচ্ছে, অত নামজাদা একটা স্টার আসছে, এ তো আর রোজ হয় না। মেদিনীপুরের ব্যাপার তো ভগবানের দয়ায় বছরে দু-পাঁচটা হচ্ছেই, আজ না পারি এর পরেও সাহায্য করা যাবে…"

গায়ে লাগিবার জন্যই বলা, হরকালী প্রশ্ন করিল, "কিন্তু টিকিট না কিনে তোমার স্টারের নাচ দেখছ কোথা থেকে শুনি?"

অনিল বলিল, "কেন, তুমি টিকিটগুলো তো বন্ধুবান্ধবদের জন্যেই কিনছ। আমি কি একটাও আশা করতে পারি না ? আমি কিনবও কুঁতিয়ে-কাঁতিয়ে হদ্দএকটাআট-আনা কি এক-টাকার টিকিট, তার চেয়ে…"

ভানু হঠাৎ উঠিয়া পড়িল, বলিল, "ওহে শৈলেন, শোন, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম—যার জন্যে এতটা আসা।"

আমায় রাস্তার দিকে একান্তে লইয়া সন্দিগ্ধভাবে মাথাটা একটু ঢুকাইল, বলিল- "আজ বলব ?…থাক্, কালই বলা যাবে'খন, আর একটা দিন দেখি।…আমি তা হ'লে আসি এখন, সুনীলের কাছে একটু যেতে হবে; কাল কিন্তু থেকো বাড়িতে এই সময়।"

বিনোদ গলা তুলিয়া বলিল, "ভানু চললে না কি হে ? দাঁড়াও, আমিও ওই দিকেই যাব।"

অনিল এবং হরকালীও চলিয়া গেল।

গোবর্ধন বলিল, "একটু ঘরের ভেতর চলো, শৈল-দা।"

দুই জনেই উঠিয়াছি, এমন সময় কানে আসিল, "কে, আমাদের গোবর্ধন নাকি ?"

রাস্তার পানে চাহিয়া দেখি বিশ্বম্ভর-কাকা।

বিশ্বম্ভর-কাকার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ঠিক কাকার মতো বয়স নয় ওঁর। একটির পর একটি শেষ করিয়া যথাক্রমে চারিটি বিবাহ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টে মোটা মাহিনার চাকরি করিতেন, শেষ বিবাহটি রিটায়ার করিবার পর, প্রায় বছর-সাতেকের কথা হইল। চুলে কলপ দিয়া এবং সর্বদাই ফিটফাট থাকিয়া বয়সটাকে যেন আট-কাইয়া রাখিয়াছেন। কথাবার্তার একটি বিশেষ ঢো আছে—বড়দের সঙ্গে কথাবার্তায় বলেন—'আপনার ভাদ্দরবউ বললে…'—ছোটদের সঙ্গে হইলে বলেন, 'তোমার খুড়ী বললেন…' ইত্যাদি।

এই করিয়া আমাদের মহলে শাশ্বত কাকা হইয়া আছেন।

আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিলেন, "তুমি এখানে, আর তোমার সারা দুনিয়ায় খোঁজ পড়ে গেছে, কিছু নয় তো চার বার তোমার বাড়িতে লোক পাঠিয়েছে তোমার খুড়ীমা। ভীষণ খাপ্পা, বলছে—'এক বার আসুক গোবর্ধন, আমাদের ফাঁকি দিয়ে নাচের ব্যবস্থা করা বের করছি,' বলেন,...এই যে শৈলেনও রয়েছ, একি কাণ্ড করেছে বল দিকিন! মেদিনীপুরের জন্যে টাকা তুলবে, সোজা কথায় বললেই হ'ত, সিনেমা স্টারের হুজুগ তুলে মেয়েদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে একি হয়েছে?...তার পরে নাচ যা হবে তা তো বুঝতেই পারছি—এদিকে হ্যাণ্ডবিলে তো আকাশে তুলে দিয়ে বসে আছ।"

বিশ্বম্ভর-কাকা গোবরা কি উত্তর দেয় শুনিবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, গোবরা তাড়াতাড়ি বলিল, "আজ্ঞে কাকা সে কি বলছেন?—নাচগান, এ্যাক্‌টিং, পোজ, ফিগার সবতেই সাহানা দেবী আজকাল ফার্স্ট যাচ্ছেন—ওর মধ্যে একটা কথাও যদি মিথ্যে হয় তো..."

বিশ্বম্ভর-কাকার মুখটা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন, "ওসব বাজে কথা ছাড়ো, রিজার্ভ সীটগুলো সব বিলি করে ফেলেছ তো?"

"আজ্ঞে না, খানকয়েক আছে এখনও।"

"তোমাদের খুড়ীমা বললে—আমায় পেছন দিকে সীট দিলে কিছু আর বাকি রাখব না গোবর্ধনের, আমি কানা মানুষ, চোখে চশমা দিয়ে তবে দেখতে পাই, সেটা যেন সে মনে রাখে,'—চার বার লোক পাঠিয়েছে তোমার কাছে। তোমরা হাঙ্গাম বাধাবে, খরচে খরচে আমার ওষ্ঠাগতপ্রাণ। ফেরবার সময় এক বার ঐ দিক হয়ে যেও।... দাঁড়াও দেখি..."

পকেট থেকে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, "আছে টিকিট তোমার সঙ্গে?"

গোবরা একটা বই বাহির করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ, এই যে।"

"তা হ'লে দিয়েই দাও খান-তিনেক—মেয়েটার অর্ধেকের বেশি চার্জ দিচ্ছি না কিন্তু।"

ছেলেমানুষের মত পাশের লোককে সাক্ষী রাখিয়া কথা কহিবার অভ্যাস, আমায় আবার বলিলেন, "কি ভোগান্তি বল দিকিন শৈলেন? কান দুটো ধরে মলে দিতে ইচ্ছে করে না এ উপদ্রবের জন্যে? হ্যাঁ, বুঝতাম একটা ভাল লোক কেউ আসছে…"

হাসিয়া বলিলাম, "চিরকালই তো এই রকম ওর…।"

তিনখানা টিকিট লইয়া প্রসন্ন মনে শিস দিতে দিতে চলিয়া গেলেন।

ভিতরে গিয়া আমরা টেবিলের সামনে দুইখানা চেয়ার টানিয়া বসিলাম। গোবরা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তোমায় এর মধ্যে টানতে চাই না শৈল-দা, তাই এসেই ঐ ভাঁওতাটুকু দিয়েছিলাম।"

পকেটের মধ্যে বাঁ হাতটা প্রবেশ করাইয়া দিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "এই হ'ল নমুনা শৈল-দা, মানে নাচ দেখিয়ে মেদিনী-পুরের জন্যে টাকা চাওয়া হচ্ছে বলে সবার প্রাণে বড্ডই আঘাত লেগেছে!"

আমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার একটু হাসিল, তাহার পর তিনটা পকেট থেকে টানিয়া টানিয়া একরাশ নোট টেবিলের উপর জড় করিল, এক টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা—হরেক রকমের। শেষ হইলে আর এক বার হাসিয়া বলিল, "এক বার,—ওর নাম কি—আঘাতের পরিমাণটা দেখো!"

সবগুলা আলাদা আলাদা সাজাইয়া গুনিয়া দেখা গেল একুনে তিন শত বিয়াল্লিশ টাকা।

আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম, "ভানু—এদের টাকা নিয়ে সাড়ে তিন-শ'র ওপর তো এইখানেই হ'ল।...পাঁচ-শ পর্যন্ত ঠেকিয়ে দেবে বোধ হয়...তোমায় যে কি বলে..."

গোবরা তাড়াতাড়ি বলিল, আশীর্বাদ-অভিশাপের কথা পরে হবে শৈল-দা, কাজটা আগে শেষ করি। পাঁচ-শ তো গালাগাল শৈল-দা, হাজার পর্যন্ত না পারি, এর ডবলে তো সন্দেহই নেই, এখনও দুটো দিন হাতে রয়েছে।"

বলিলাম, "বল কি! আর ঐ যে বললে—সাহানা দেবীকে এক পয়সাও দিতে হবে না, ওটাও কি সত্যি?"

গোবরা কামিজের গলার বোতাম খুলিয়া ডান হাতটা বুকের কাছে লইয়া যাইতে যাইতে থামিয়া গিয়া বলিল, "নাঃ, গোবরার মুশকিল যে পৈতে ছুঁয়ে বললেও বিশ্বাস করবে না।...এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে ওর চেয়ে বড় সত্যি কথা আর একটাও নেই শৈল-দা।...নাও, টাকাগুলো রেখে দাও। আমি আবার কাল এই সময় বা আর একটু পরে আসব। এখন উঠি, এদেরগুলো আদায় করে ফেলিগে..."

উঠিতে যাইতে চাকরটা ট্রে করিয়া সকলের জন্য চা লইয়া উপস্থিত হইল।

গোবরা আবার বসিয়া পড়িল, বলিল, "ভারতীয় চা!"

চাকরটা প্রশ্ন করিল, "আর সব বাবুরা চলে গেছেন? এ তিনটে কাপ নিয়ে যাই তাহলে?"

গোবরাই উত্তর দিল, বলিল, "না, ভাগোঃ...বিখ্যাত চাঁদাক গোবর্ধনবাবু বলেন যখনই আমার পরের মণিব্যাগ খালি করিবার মহৎ উদ্দেশ্য মনে উদয় হয়, আমি একাদিক্রমে পাঁচ-ছয় কাপ করিয়া চা পান করিয়া লইয়া থাকি। মস্তিষ্কে কূটবুদ্ধি সঞ্চার করিতে ভারতীয় চায়ের

মত কোন বস্তুই যে নাই একথা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।...আমারও একটা ফটো তোলবার ব্যবস্থা করে দাও না শৈল-দা।"

চারিটি কাপ শেষ করিয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে রকের সিঁড়ি পর্যন্ত গেল, তাহার পর আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, কালকে এসে যদি দেখি কেউ বসে আছে তো আজকের চেয়েও জোর ক্যানভাসিং লাগাব শৈল-দা তোমার সঙ্গে, বলব দু-দিন থেকে হাজরি দিচ্ছি, তবুও মন টলাতে পারলাম না তোমার?"

যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া বসিল, "তুমি অবশ্য টলবে না, তাহ'লে পরশু আসা আবার বন্ধ হয়ে যাবে আমার।"

তৃতীয় দিন আসিয়া সে-দিনের সমস্ত উপার্জন গণিয়া দিয়া গোবরা বলিল, "তাহলে হ'ল গিয়ে পরশু তিন-শ বিয়াল্লিশ, কাল তিন-শ পাঁচ, আর আজ এই এক-শ সাতানব্বই;—সবশুদ্ধ আট-শ চুয়াল্লিশ।"

একটু যেন নিরাশ হইয়া বলিল, "না, মেহনতই সার হ'ল, ভেবেছিলাম হাজার পর্যন্ত টেনে তুলব।"

বলিলাম, "গেটে বিক্রী আছে, মনে হয় হাজার টপকেই যাবে।"

গোবরা তাড়াতাড়ি বলিল, "বাপ্‌রে, গেটের হাঙ্গাম কখনও রাখি!...হ্যাঁ, এখন যা আসল কথা—বাবাজী পরশু ঠিক আসছেন তো?"

বলিলাম, "হ্যাঁ আজও তাঁর চিঠি পেলাম। কিন্তু গোবর্ধন, তাঁকে ও নাচের মধ্যে টেনে তুলতে পারব না ভাই; তিনি প্রকৃতই একজন সাত্বিক মানুষ, ওসব..."

গোবরা এমন ভাবে আমার মুখের পানে চাহিল, যেন আকাশ থেকে পড়িয়াছে, বলিল, "গোবরার কি পরকালের ভয় নেই শৈল-দা? নাচ

কোথায়?···খানকতক হ্যাণ্ডবিল ছাপালেই যদি সাহানা দেবী এসে পড়তো, তাহ'লে তো আর তার ব্যবসা চলত না। এই নিন পড়ুন · থাক্, আমিই পড়ে দিচ্ছি; কিন্তু একটা সর্ত শৈল-দা, উল্টে দিতে পারবেন না—চার দিন আহার নিদ্রা কাকে বলে জানি নে।"

গোবরা পড়িতে লাগিল—

"আসুন! শুনুন্!! ধন্য হউন!!!

স্থানীয় টাউন হলে মহাপুরুষের অগ্নিময়ী বক্তৃতা!!!

একেই কি বলে 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে?' মেদিনীপুর প্লাবন-ত্রাণ-সমিতির উদ্যোক্তরা অর্থ সংগ্রহের জন্য টাউন হলে বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী সাহানা দেবীর নৃত্য-গীত এবং অভিভাষণের আয়োজন করিয়া স্থানীয় ভদ্র সমাজে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; যেহেতু পরে জানা গেল এ-উপায় স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ একেবারেই অনুমোদন করেন নাই। উদ্যোক্তাগণ যেখানেই গিয়াছেন প্রচুর আনুকূল্য এবং অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন, কিন্তু একটা মহৎ কার্যের জন্য বিলাস-আয়োজনরূপ হীন পন্থা অবলম্বন করায় সকলেই মর্মাহত হইয়াছেন। উদ্যোক্তারা সবিশেষ লজ্জিত, এবং তাঁহাদের একমাত্র নিবেদন এই যে তাঁহারা শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা অত্রত্য মহৎপ্রাণ নাগরিকদের ক্ষমার্হ।

"এই সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইলেও এই আয়োজন রদ করিবার উদ্যোক্তাদিগের হস্তে কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু ভগবান্ সাধু ব্যক্তিদিগের সমবেত মর্মশ্বাস শ্রবণ করিয়া তাঁহার অশেষ করুণায় নিজেই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কল্য রাত্রে উদ্যোক্তারা শ্রীমতী সাহানা দেবীর নিকট হইতে তারযোগে সংবাদ পান যে কোন অনিবার্য কারণে তিনি উপস্থিত হইতে অসমর্থা।

সংবাদ পাইয়াই উদ্যোক্তরা রাত্রের ট্রেনেই মিশনের অক্লান্ত কর্মযোগী,

অধুনা মেদিনীপুর-আর্তসেবা-নিরত শ্রীশ্রীল ধীরানন্দ মহারাজজীর নিকট লোক পাঠান। উদ্যোক্তারা বিশেষ হর্ষের সহিত তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকদের বিদিত করিতেছেন যে, অদ্য দ্বিপ্রহরে তারযোগে সংবাদ পাওয়া গেছে যে অত্রত্য সহরবাসীদিগের পক্ষে উদ্যোক্তাদের শ্রদ্ধা ও আগ্রহ দেখিয়া শ্রীশ্রীল মহারাজজী মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য আসিয়া সর্বসমক্ষে মেদিনীপুর সম্বন্ধে তাঁহার নিদারুণ অভিজ্ঞতা বর্ণন ও এতদ্বিষয়ে দেশবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ দিতে সম্মত হইয়াছেন।

"বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষের প্রতিধ্বনি শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আজ আপনাদের কাছে উপস্থিত, কর্ণগোচর করিয়া জীবন ধন্য করুন। নূতন করিয়া দরিদ্রনারায়ণ সেবায় প্রণোদিত হউন।

"অভাবনীয় সুযোগ! স্থানীয় টাউন হল!! আগামী ৪ঠা নভেম্বর, শুক্রবার দিবা ৫ ঘটিকা!!!

"বাংলার নারী, বাংলার পুরুষ, বাংলার যুবা, বাংলার আশা, বাংলার ভরসা—

"বাংলার যুগ-বিশ্রুত সেবামন্ত্রে আবার দীক্ষিত হউন।

ওঁ তৎসৎ! ওঁ তৎসৎ!! ওঁ তৎসৎ!!!"

আমি বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলাম, এতবড় একটা প্রবঞ্চনার শেষে 'ওঁ তৎসৎ' জুড়িবার ঘটা দেখিয়া একেবারে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। গোবরা আমার পানে একটু আড়ে চাহিয়া বলিল, "ভেক না হ'লে কখনও ভিক্ষে মেলে শৈল-দা?···হ্যাঁ, এটা মাস্টারমশায়কে দিয়েই লিখিয়ে নিলাম, বেশ হয় নি?"

অনেক কষ্টে হাসি সামলাইয়া বলিলাম, "তা তো হয়েছে, কিন্তু করেছ কি গোবর্ধন! এ যে মার খাবার মতলব করেছ, তা ভিন্ন পুলিস কেস হ'তে পারে!"

গোবরা একটু ঠোঁট চাটিয়া লইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পুলিস সাহেব সমস্তটাই জানে, আপনাদের আশীর্বাদে একটু নেকনজরে দেখে। হেসে শুধু বললে, 'You will be in deep water, Babu' (তুমি মহা ফ্যাসাদে পড়ে যাবে বাবু)···ওদিকে কিছু ভয় নাই শৈল-দা। আর মারের কথা···"

গোবরা হঠাৎ নিচু হইয়া আমার পায়ের ধূলা লইল, বলিল, "এ সহরে গোবরাকে মারে সে এখনও জন্মায় নি শৈল-দা।"

ভয় আমার ঘুচিতেছে না, বলিলাম, "এর মধ্যে রয়েছেন ভেবে তাঁকেও তো অপমান করতে পারে।"

গোবরা বলিল, "ঐ তো নয় শৈল-দা, অপমানই যদি গায়ে মাখলেন তো আর বাবাজী কি?···কিন্তু সেদিকে আপনার কিছু ভয় নেই। কি রকম প্রোসেসনটা করে স্টেশন থেকে নিয়ে আসি একবার দেখবেন না। গোবরা কি এতই অসহায় শৈল-দা? তা ভিন্ন যারা গুণ্ডামি করতে পারে তাদের মধ্যে তো বেচিও নি টিকিট, আর গেটে বেচার হাঙ্গামাই তুলে দিয়েছি। সে সব কিছু ভয় নেই শৈল-দা। এখন শুধু এইটুকু দেখতে হবে যে বাবাজী ভেতরকার ব্যাপারটা যেন টের না পান, তাহ'লে আবার হাত গুটিয়ে বসবেন,—বিপদ তো একরকম নয়!"

যাইতে যাইতে রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসিয়া গোবরা বলিল, "আসল কথাই ভুলে যাচ্ছিলাম, কাল সন্ধ্যের সময় কয়েক জন লোককে তোমার এখানে চায়ের নেমন্তন্ন করতে হবে শৈল-দা, তোমার এ বাতিকটা তো আছেই, কালও একবার হয়ে যাক; এই নাও লিস্ট্। খরচটা আমি হ'লে চাঁদা থেকেই টেনে নিতাম, তা—তুমি তো আর···"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "খরচের কথা থাক্, কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি?"

"ট্রেড সিক্রেট্ শৈল-দা"—ঈষৎ হাস্যের সহিত কথাটা বলিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন যথাসময়ে আমরা জনদশেক সামনে চা আর খাবারের প্লেট লইয়া বসিয়া আছি—ভানু, বিশ্বম্ভর-কাকা, হরকালী এরা সবাই আছে—গোবরা হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া হাজির হইল, একবার সবার উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল "এই যে সবাই রয়েছেন দেখছি—আপনারা যা চেয়েছিলেন তাই হয়ে গেল—এখন বুঝছি এ্যাকট্রেসের হাঙ্গাম করাটা সত্যিই ভালোও হ'ত না।...সবাই যাবেন, কাল পাঁচটা—টাউন হল্।...শৈল-দা, আমার এক তিল দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী এক বার অতি অবিশ্যি করে ডেকে পাঠিয়েছেন—দেশী অফিসার হ'লে এই সুবিধে—কবে যে স্বরাজ হবে...একটা কথা, বাবাজীকে এনে আপনার এখানেই তুলব, বেশিক্ষণ নয়—চারটেয় এ্যারাইভেল্—প্রোসেসন—পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত টাউন হল্—আবার নটায় গাড়ি—ভানুদা কি বিশ্বম্ভর-কাকার ওখানেই তুলতাম—বড্ড দূরে পড়ে যায়...আসি তা'হলে...না না, মরবার ফুরসৎ নেই, বলছেন—চা খেয়ে যাও!"

ট্রেড সিক্রেট্‌টা বোঝা গেল। একবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবার মুখের উপর দৃষ্টিটা গিয়া পড়িল,—বিস্ময়, কি নিরাশা, কি আক্রোশ, অথবা এক সঙ্গে সব—বোঝা শক্ত।

পরদিন স্টেশনে গিয়া দেখিলাম প্রায় শ'দু-এক স্কুলের ছেলে লইয়া একটি মাঝারি সাইজের প্রোসেসনেরও ব্যবস্থা করিয়াছে গোবরা, জনকুড়ি-পঁচিশকে কোথা হইতে যোগাড় করিয়া গেরুয়া আলখাল্লাও পরাইয়া দিয়াছে, সবার হাতেই 'ওঁ তৎসৎ' পতাকা।

খানিকটা পথ ঘুরিয়া সাড়ে পাঁচটার পর আমরা টাউন হলে প্রবেশ করিলাম। ওঁ তৎসৎ-এর এখানেও ছয়লাপ, কিন্তু অতবড় হলটায় টিকিট সেলের দিক দিয়া যেখানে আমরা অন্তত হাজার দুয়েক লোকের

আশা করিয়াছিলাম, সেখানে জোর দুই-শ কি আড়াই-শ' চেয়ার পাতা রহিয়াছে। একান্তে গোবরাকে প্রশ্ন করিলাম, "করেছ কি!"

গোবরা বলিল, "ওঁ তৎসৎ আমার হাতে, তাতে তো কম করি নি; মানুষ তো আমি টেনে আনতে পারি না, মিছিমিছি কুলিগুলোকে দিয়ে চেয়ার বওয়াই কেন? আধ ঘণ্টারও বেশি হয়ে গেল, আর লোক আশা করো?—আমার হিসেব ঠিক আছে শৈল-দা, এদের নিয়েই জীবন কাটালাম তো?"

একবার শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম—স্ত্রীলোকদের আসনে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ এবং এদিক ওদিক আরও কয়েক জন বর্ষীয়সী মহিলা লইয়া হদ্দ জন-তিরিশেক হইবে, বেটাছেলেদের দিকে গুনিয়া-গাঁথিয়া এক শতের অধিক নয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি জেলা-অফিসের অফিসার, কেরাণি। আমরা আসিতে ভলণ্টিয়ারদের অনেকে গিয়া খালি আসনগুলি দখল করিল।

মেদিনীপুরের প্লাবনের সম্বন্ধে, ব্রহ্মচারী ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া যাইতেছেন,—"গিয়ে দেখলাম এক একটা গ্রামে যে লোক ছিল কোন কালে, এমন কোন চিহ্নই নেই—এক এক জায়গায় মৃত পশুর স্তূপ, তার সঙ্গে মানুষের শব—ধ্বংসের দেবতা লোকালয় ভেঙে নরকের সৃষ্টি করেছে—সমুদ্রের বালি তার তৃষিত লালায়িত জিব দিয়ে সবুজ শস্যের শেষ কণাটি পর্যন্ত যেন নিঃশেষ করে ফেলেছে—কি অসহ্য দৃশ্য। যারা রয়েছে তাদের মানুষ বলে চেনা যায় না—ক্ষুধায়, লজ্জাহীনতায়, নিরাশায় তাদের চোখে অমানুষিক দৃষ্টি—জীবজগতে তারা কি কখনও আমাদেরই স্বজাতি ছিল?...আমি সন্ন্যাসী, কিন্তু ভগবানকে যেন আর দেখতে পাচ্ছি না, তাই গভীর নিরাশায় মানুষের কাছে ছুটে এসেছি—যে ভগবান তাদের মধ্যে লুপ্ত হয়েছেন, তিনি আপনাদের মধ্যে পূর্ণ দীপ্তিতে

আগুন—ভাইয়ের বোনের মুখে অন্ন দিয়ে, লজ্জা নিবারণ করে, একটু মাথা গোঁজবার সংস্থান করে দিয়ে আপনারা আবার আমাদের ভগবানে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলুন…"

সামনের ভাবলেশহীন মুষ্টিমেয় শ্রোতৃবৃন্দের পানে চাহিয়া বসিয়া আছি। বক্তার পাশেই আছি, কিন্তু মনে হইতেছে যেন কত দূর থেকে একটা ক্ষীণ আবেদন কানে ভাসিয়া আসিতেছে, "মানুষের কাছে ছুটে এসেছি…ভগবানে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলুন…"

আমার মনোনেত্রে একটা দৃশ্য কেমন করিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে… এই টাউন হল—রিজার্ভ সীটে সরকারী খুড়ীমা সহ সরকারী খুড়া বিশ্বম্ভর-কাকা—পরিপাটি সাজসজ্জা…আরও সবাই—তাহাদের পিছনেও মানুষের সমুদ্র—রিজার্ভ, ফার্ষ্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, গেলারী—লোককে আর জায়গা দেওয়া যায় না…সম্মুখে সুসজ্জিত স্টেজে নৃত্যপরা তারকা—তারকাই বটে, বিদ্যুতের আলো চঞ্চল রূপের উপর পড়িয়া যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে…

হঠাৎ ব্রহ্মচারীর ক্ষীণ আবেদনটুকুও নিমজ্জিত করিয়া বাহিরের রাস্তায় ব্যাণ্ডের সঙ্গে লাউডস্পীকার সিনেমার বিজ্ঞাপন নিনাদিত করিয়া উঠিল, "আসুন, আপনাদের চিরপ্রিয় 'অতঃ কিম্'—অলকায় পঞ্চম এবং শেষ সপ্তাহ —'অতঃ কিম্—অতঃ কিম্…'

[প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৫০]

সমাপ্ত